যারা বলে আমরা "হিন্দু" নই আমরা "মানুষ"

অধ্যাপক সুহাস মজুমদার

তুহিনা

যারা বলে
আমরা "হিন্দু" নই
আমরা "মানুষ"

অধ্যাপক সুহাস মজুমদার

তুহিনা
প্রকাশনী

JARA BALE AMRA "HINDU" NOI AMRA "MANUSH"
by Suhas Majumdar

প্রকাশক
গীতিকা মাইতি
তুহিনা প্রকাশনী, ৩০/৬/২এ, মদন মিত্র লেন, কলকাতা - ৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬, ই-মেল ঃ mahamayapress@gmail.com

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯২
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ মহালয়া, ১৯৯৩
তৃতীয় সংস্করণ ঃ দোল পূর্ণিমা, ২০০০
চতুর্থ সংস্করণ ঃ বইমেলা, ২০১৭

বর্ণ সংস্থাপন
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, ফোন ঃ ০৩৩-২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩, ফোন ঃ ৯১৪৩০৩৭৮১৬

মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা

অধ্যাপক সুহাস মজুমদার স্মরণে

অজিত কুমার বিশ্বাস

সম্পাদক ঃ জাতীয় অধ্যাপক মঞ্চ এবং ভারতীয় শিক্ষণ মণ্ডল

এই বই-এর লেখক অধ্যাপক সুহাস মজুমদার আজ আর আমাদের মধ্যে নেই, অকাল মৃত্যুর ফলে আমরা তাকে হারিয়েছি ১৯৯৫ সালের ৮ই জুলাই। সরকারী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করা সত্ত্বেও তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে। জীবনের শেষ সাত বছর তিনি ভারতীয় শিক্ষা মণ্ডলের শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। শেষ দুবছর তিনি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিম বাংলার সভাপতিও ছিলেন। এমনিভাবে তিনি শিক্ষক ও ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় মার্কসীয় অপশাসনের ফলে যে দুরবস্থা দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

আমাদের আগ্রহে তিনি এই বিষয়ে লেখনি ধরে প্রবন্ধ সাহিত্যে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। মাত্র এই ক'বছরের মধ্যেই তিনি চিন্তার জগতে আলোড়নসৃষ্টিকারী যে কটি পুস্তক রচনা করেছেন তার মধ্যে 'যারা বলে আমরা 'হিন্দু' নই আমরা 'মানুষ' অন্যতম রচনা। ১৯৯২ সালে জুন মাসে তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। আমাদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও সভ্যতার বর্তমান অবনতি ও অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে নেহেরু, মার্কস ও মোল্লাতন্ত্র। সুহাসদা দেখিয়েছেন এই তিনটি বিজাতীয় ধারা ভারতীয় সংস্কৃতি যা হিন্দুসংস্কৃতি নামে পরিচিত তাকে ধ্বংস করতে একত্রিত হয়েছে সুহাসদা তার লেখার মধ্য দিয়ে এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের কথাই অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন।

বাংলার সমাজে এই দেশবিরোধী 'বাজার' সংস্কৃতি মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে প্রচারের ফলে এক শ্রেণীর দুর্বুদ্ধিজীবী মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা হিন্দুত্বের বিরোধী তার সঙ্গে ইসলামের জেহাদ এবং মার্কসবাদীদের 'শ্রেণী সংগ্রামের' নামে ঘৃন্য ও নিম্নস্তরের ফ্যাসীবাদী চিন্তার সমর্থন করে চলেছে।

সুহাসদা লিখেছেন 'যারা বলে আমরা 'হিন্দু' নই আমরা 'মানুষ' এই সব মানুষের হিন্দু বিদ্বেষের ফলে স্বাধীন হবার ৫৩ বছর পরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যে ভারত অনেক পিছিয়ে। নেহেরু-মার্কসবাদের প্রভাবে কংগ্রেসে ও কমিউনিস্টরা ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগকে মেনে নিয়েছে। আজ ভারতের সব সমস্যার মূলে রয়েছে সেই দেশভাগ। এই দেশভাগ যারা সমর্থন করেছে তারাই আজ বলছে আমরা 'হিন্দু' নই আমরা 'মানুষ'। এদের হিন্দু বিদ্বেষের ফলে এদেশে মানবধর্মের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শ্মশান বন্ধু হয়েছে।

ভারতবর্ষে এক শ্রেণীর হিন্দুই হিন্দুর সবচেয়ে বেশী সর্বনাশ করেছে। মাইনরিটিজম এর রাজনীতিই হিন্দুর সর্বনাশের মূল। কংগ্রেস-কমিউনিস্টদের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বনাথ প্রতাপ-লালু-মুলায়েমরা যে ধরনের সংকীর্ণ বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে সুহাসদা প্রথম থেকেই তার বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি দেখিয়েছেন পণ্ডিত নেহেরুর নামাঙ্কিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানদের শ্রান্তিহীন কলমবাজির বিরামহীন বিষোদগারের ফলে অর্ধ শতাব্দী ধরে হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছে এই শ্রেণীর প্রচারযন্ত্রগুলোই। হিন্দুরাষ্ট্র যদি এই সারাভারতব্যাপী হিন্দুঘাতী প্রচারের শুকরনিবাসগুলির সংকার করতে না পারে তবে সে তার ন্যূনতম কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হবে।

আজ সংবিধান পর্যালোচনা করার জন্য একটি কমিটি হয়েছে। অধ্যাপক সুহাস মজুমদার ১৯৯২ সালে লিখেছেন আমাদের সংবিধানে ২৫ থেকে ৩০ ধারায় Protection of Minorities-এর কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু মেজরিটির ধর্ম Protection-এর কথা সংবিধানের কোথাও নেই। পৃথিবীর কোন সংবিধানে মেজরিটির থেকে মাইনরিটিকে বেশি 'Right' দেওয়া হয় নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা বা কনভেন্ট তৈরি করে কোরান-হাদিস ও বাইবেলের গসপেল শেখান চলবে এবং সেই সব প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্থ পাবে। কিন্তু মেজরিটি সমাজ তার ধর্ম সংস্কৃতি পড়াতে পারবে না। ফলে দেশে নিজেকে মাইনরিটি ঘোষণা করার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে সবাই। তাই রামকৃষ্ণ মিশন এর মত প্রতিষ্ঠানও 'হিন্দু' নই বলার কথা বলতে পারে বা ভাবতে পারে।

অধ্যাপক সুহাস মজুমদার জেহাদী ইসলাম, মিশনারি খ্রীস্টানি এবং হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করা এক শ্রেণীর দুর্বুদ্ধিজীবী 'হিন্দু'দের সমস্যাটাই এই ছোট পুস্তকের মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন।

'উদার পন্থী, প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িকতা মানবতাবাদী হিন্দুর হিন্দুত্ব নিয়ে অনবরত হাস্যমুখর সজ্জনবর্গের উদ্দেশ্যে আমার জিজ্ঞাসা। এ দেশে হিন্দুর অস্তিত্ব যদি লোপ পায় তবে তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বও কি নিরাপদ থাকবে?'

এই সব কথাই অধ্যাপক সুহাস মজুমদার বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, বাংলার আজকের এই দুরবস্থার মূলে রয়েছে মেকলে, সর্বনাশা বামপন্থা ও মোল্লাতন্ত্রের প্রভাব। বাংলাকে বাঁচাতে হলে এই তিন শত্রুর তথাকথিত মেকী ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ মানুষের সামনে খুলে দিতে হবে।

আজ আমরা আবার সেই দূরদর্শী সুহাস মজুমদারকে স্মরণ করি। তার অসমাপ্ত কাজকে আমাদের সমাপ্ত করতে হবে এই সমস্ত বই প্রচারের মধ্য দিয়ে।

—দোলপূর্ণিমা, ২০০০

২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

ছাপা হওয়ার দু-তিন মাসের মধ্যেই এ বই-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়। গল্প-উপন্যাসের বাইরে বাংলা বই এর এই জনপ্রিয়তা আশ্চর্য, কিন্তু এক্ষেত্রে অস্বাভাবিক নয়। হিন্দুসমাজ যে কতদিক থেকে শত্রুবেষ্টিত, তা নিয়ে লোকের একধরনের অস্পষ্ট অনুভূতি আছে, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে ঐ শত্রুপুঞ্জের পরিচয় ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে প্রাঞ্জল রচনা বাংলার বড় দুষ্পাপ্য। সন্দেহ নেই ওরকম প্রাঞ্জল আলোচনাই বইটার জনপ্রিয়তার কারণ।

একটা কথা প্রথম সংস্করণে গুরুত্ব পায়নি। সেইজন্যই দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে দেরি হল। হিন্দুর সর্বধর্মসমভাবের তত্ত্ব বহুকাল যাবৎ বিধর্মিঘাতী ধর্মগুলির বর্বরতার প্রশ্রয় দিয়ে এসেছে—এখনো দিচ্ছে। এখন এই তত্ত্বের একটা বিলাতী নামকরণ হয়েছে—সেকুলারিজম। এও এক ধরনের সর্বধর্মসমভাবের তত্ত্ব বটে, কিন্তু এতে সমভাবের পাত্র মানা হয়েছে বিশেষভাবে মাইনরিটির ধর্মগুলিকেই। এই সেকুলারিজম আধুনিক হিন্দুর গলার ফাঁস হয়ে উঠেছে। এর দোহাই দিয়ে হিন্দু-জাতিকে আজ কতরকম ভাবে আত্মহত্যার মন্ত্রণা দেওয়া হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। রামকৃষ্ণ মিশন হিন্দু-সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেকুলারিজম বা সর্বধর্মসমভাবের দোহাই দিয়ে এখনো সে হিন্দুর কাছ থেকে প্রণাম ও প্রণামী আদায়ের লোভ ছাড়তে পারে নি। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ শিকাগো বক্তৃতার শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সম্প্রতি 'আনন্দবাজারে' একটা লেখা ছাপিয়েছেন। তাতে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোতে হিন্দুধর্মের গৌরব ঘোষণা করতে যাননি, গিয়েছিলেন সর্বধর্মের প্রচারক হিসাবে। লোকেশ্বরানন্দ মহারাজ বাঙালী ও হিন্দু পাঠককে অবোধ বালক ভাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এও বলতে হবে শিকাগো বক্তৃতায় হিন্দুধর্মের অংশরূপ সর্বধর্মের সত্যকার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কেউ যদি ঐ বাক্যটাকে আলগা ক'রে তুলে এনে এর হিন্দুমূলটা অস্বীকার ক'রে স্বতন্ত্রভাবে জাহির করতে চায়, তবে তাকে নিরস্ত করার কোনো উপায় নেই। প্রহ্লাদ 'ক' বলতে 'কৃষ্ণ' বুঝে ভাবের আদেশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেন, হিন্দুরাও 'সর্বধর্মসমভাব' শুনে আর কোনো কথায় কান দিতে চায় না। আধুনিক হিন্দুর পক্ষে এত বড় আত্মঘাতী মন্ত্র আর নেই।

এই জন্য এই সংস্করণে আমি 'যারা বলে সব ধর্মই সমান' নামে একটা নূতন প্রবন্ধ যোগ করেছি। আমি দেখিয়েছি হিন্দুর সেরা ধর্মগ্রন্থগুলিতে 'সর্ব-উপাসনার সাম্য'ই প্রচার

করা হয়েছে সর্বধর্মের নয়। অর্থাৎ 'নামাজী ইসলামকে' হিন্দু খাতির করতে পারে, কিন্তু 'জেহাদী ইসলামকে' খাতির করার কোন যুক্তি নেই। এমনকি যীশুকেও কোন হিন্দু ভজনা করতে পারে কিন্তু মিশনারী খ্রীস্টানকে কোল দিতে সে বাধ্য নয়।

একটা ব্যক্তিগত কথা বলে এই বিজ্ঞাপন শেষ করব। আমার বই কিছু হিন্দুর চোখ খুলে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সেকুলার বন্ধুবর্গের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে আদৌ সফল হয়নি। আমি নিজের যে কয়টি 'সেকুলার' বন্ধুকে এই বই উপহার দিয়েছিলাম তাঁরা এটিকে যত্ন করে ছেঁড়া কাগজের বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই চরিত্রসম্মত কাজটা আমার হাস্যরসের ধারাটা শুকিয়ে আনতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁদের পণ্ডশ্রমের কথা ভেবে আমি দুঃখ পেয়েছি। এই বই এর পৌনঃপুনিক মুদ্রণ সম্ভাবনার ফলে তাঁদের ছেঁড়া কাগজের বাক্সের পৌনঃপুনিক স্ফীতির সম্ভাবনা দেখে আমি শঙ্কিতও হয়েছি।

মহালয়া, ১৯৯৩ **সুহাস মজুমদার**

মুখবন্ধ

আমার উপর ফরমাস এসেছিল হিন্দুজন্মের গৌরব নিয়ে কিছু লিখতে হবে। এ কাজে আমার আগ্রহ আছে, কিন্তু যোগ্যতা আছে কিনা সন্দেহ। ৪৭ সাল থেকে দেশে যে বিপরীত স্রোত বইতে শুরু করেছে, অনেকের মতো আমিও তার ভুক্তভোগী। আমার মধ্যে হিন্দুত্বের চিহ্ন শুধু নামটুকুর মধ্যে পর্যবসিত হয়েছে, এমন কি আমার পদবীটাও বিশেষভাবে হিন্দুর নয়। বাহ্য হিন্দুত্বের লক্ষণ ধরতে গেলে আমাকে আদৌ হিন্দু বলা যায় কিনা সন্দেহ। অবশ্য বোরখা, বা গোঁফহীন দাড়ি যে অর্থে সারা বিশ্বের মুসলমানের 'সনাক্তচিহ্ন' হিন্দুর তেমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য 'সনাক্তচিহ্ন' নেই। এককালে এটাকে আমরা হিন্দুর মর্মগত উদারনীতির লক্ষণ বলেই জানতাম। কত বড় উদারনীতির লক্ষণ, শিখদের দৃষ্টান্তে তা খুব স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। গুরু গোবিন্দ হিন্দু-সমাজ রক্ষার জন্য একটা কেশধারী ক্ষত্রিয় বাহিনী তৈরি করেছিলেন—কেশ, কাঙ্গা, কড়া, কচ্ছ, কৃপাণ এই পাঁচ 'ক-কার' মিলিয়ে তিনি সেই বাহিনীর নাম দিয়েছিলেন 'খালসা' (pure)। আমি যতদূর বুঝেছি খুশবন্ত সিং-এর মতো man about town-এর দিকে তাকিয়ে তিনি খালসা চিহ্ন তৈরি করেননি। কিন্তু যখন থেকে খালসা চিহ্ন ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং man about town-এর মধ্যে প্রচার লাভ করল, তখন থেক রব উঠল শিখারা হিন্দু নয়। খুশবন্ত নিজে এই মতের এক মস্ত প্রচারক। কিন্তু তাঁর মতো লোক যদি নিজেকে 'খালসা' বলতে পারে তবে আমার মতো লোকেরও হিন্দু বলাতে দোষ কী? আমি বলতে পারি, আমি অন্তত হিন্দুত্বের কোনো 'খালসা' চিহ্ন ধারণ করে 'খালসা হিন্দুত্বের' অপমান করিনি।

কিন্তু এ তর্কের আরেকটা দিকও আমি অস্বীকার করতে পারি না। সমস্ত উদারনীতিরই একটা লক্ষণরেখা থাকা উচিত—আমার মতো লোক সেই লক্ষ্মণরেখাটাও অতিক্রম করেছে বলে বোধ হয়। নিষিদ্ধ পানভোজন আমি এড়িয়ে চলতে পারিনি। আমার পোশাক-আশাকে হিন্দুত্বের ছাপ নেই, পূজা-আর্চায় আমি অব্যবসায়ী, তীর্থভ্রমণের চেয়ে ঐতিহাসিক স্থানে বেড়িয়ে বেড়াবার ঝোঁকই আমার মধ্যে প্রবল। উল্টোদিকে, সমস্ত বাহ্য লক্ষণের চেয়ে বড় হিন্দুত্বের লক্ষণ যে চিত্তশুদ্ধি বা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন সে দিকেও আমি লেশমাত্র অগ্রসর হয়েছি বলা যায় না। এরকম মানুষ কি হিন্দুধর্মের গৌরব ঘোষণা করতে পারে?

এই দুরূহ প্রশ্ন ছাড়া আমার কাছে আরেকটা প্রশ্নও আছে। হিন্দুজন্মের গৌরব ঘোষণার আগে আমাদের বুঝে দেখা উচিত, হিন্দুজাতির অস্তিত্বও আর বজায় থাকবে কিনা। যাঁরা

জেগে ঘুমোন না তাঁরা বেশ জানেন, '৪৭ সাল থেকে প্যান-ইসলাম আর মিশনারি খ্রীস্টানি এ দেশ থেকে হিন্দুনাম লোপ করার কাজে খুব মর্মান্তিক ভাবেই তৎপর হয়েছে। তারা ঢালাও মদত পেয়েছে ডলার-স্টার্লিং-মার্ক এবং পেট্রডলারের বহির্ভারতীয় বণিকদের কাছ থেকে। জহরলাল বারবার বলতেন, ভারতের ঐক্যের পক্ষে 'হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা' 'মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা'র চেয়ে বিপদজনক। এক হিসাবে তাঁর কথা ঠিক। পৌত্তলিক বিধর্মীর প্রতি যে মর্মান্তিক ঘৃণা ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ তার দিক থেকে হিন্দুদের যে-কোনো প্রকাশভঙ্গিই 'হারাম'। সেই 'হারামজাদগী'কে 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা' বলে বর্ণনা করলে ইসলামের দিক থেকে খুব কমই বলা হয়। হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে না চললে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের মেলবার পথ নেই—উল্টোদিকে ইসলামের বিধর্মী সংক্রান্ত নীতির আমূল পরিবর্তনের আগে হিন্দুর পক্ষেও হিন্দুত্ব বজায় রেখে ইসলামের সঙ্গে মেলা সম্ভব নয়। জহরলাল এজন্য হিন্দত্বকেই বর্জনীয় ভেবেছিলেন, দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামায়নি। তাঁর সঙ্কেতকে গত পঞ্চাশ বছরে এদেশে খুব পর্যাপ্তভাবেই কাজে লাগানো হয়েছে, সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে হিন্দুত্বের কোনো চিহ্নই আজ আর বিদ্যমান নেই। কিন্তু এর ফল হয়েছে কী? তাকিয়ে দেখলে বোঝা যায়, আজকের দিনে আফ্রিকায় যা ঘটছে ভারতেও প্রায় তাই ঘটতে শুরু করেছে। আফ্রিকায় এখন একমাত্র প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে অদূর ভবিষ্যতে সে ইসলামী দেশ হবে কি খ্রিস্টানি দেশ হবে—আফ্রিকী মানুষের মতামত নিয়ে কেউ ভাবনা করে না। ভারতে ধর্মান্তরের ক্রিয়া এখনো আফ্রিকার মতো প্রবলতা লাভ করেনি ঠিকই, হিন্দু শিক্ষাসংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত মানুষ এখনো পরিবারের বা পাড়ায় খানিকটা হিন্দুধারা বাঁচিয়ে রেখেছে ঠিকই, কিন্তু সে ধারার শ্রদ্ধাবীজ এবং বিদ্যাবীজ আজ দেশ থেকে সম্পূর্ণ উন্মূলিত হয়ে যাওয়ার ফলে এবং সেইসঙ্গে ইসলামী ধর্মান্তর-ক্রিয়ার বিভীষিকার স্মৃতিকে আজ হিন্দুমন থেকে প্রাণপণ সরকারী চেষ্টার দ্বারা ভুলিয়ে দেওয়ার ফলে হিন্দুর অবস্থা এক অর্থে আফ্রিকী মানুষের চেয়েও ভয়ানক হয়ে দাঁড়িয়েছে। রণক্ষেত্রে যে সৈনিক নিরাবরণ, নিরস্ত্র ও বিবস্ত্র অবস্থায় বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে হিন্দুর অবস্থা আজ ঠিক তারই মতো। আরেকটা ধাক্কার ধকল সে সইতে পারবে না।

এইজন্য হিন্দুজন্মের গৌরব ঘোষণার আগে হিন্দুর অস্তিত্বরক্ষার কথাই আমার কাছে জরুরি বোধ হয়। দুঃখের বিষয় হিন্দুর এই অস্তিত্বরক্ষার ব্যাকুলতাও আজকের ভারতে একটা fundamentalist মহাপাপ, নিদেনপক্ষে 'কমিউন্যালিস্ট' দুর্বৃত্তপনা বলে গণ্য, —দেশের সমস্ত প্রচারযন্ত্র এই ব্যাকুলতার আঁচ পেলে রে রে ক'রে ছুটে আসে। কিন্তু দেয়ালে যার পিঠ ঠেকে গেছে সে যেমন আর পশ্চাদ্‌বর্তী হতে পারে না ভারতে হিন্দুর অবস্থাও আজ তাই। সমুদ্রে যে শয্যা পেতেছে তার পক্ষে শিশিরবিন্দুকে ডরানো বোকামি। এই জন্য হিন্দুদ্বেষী প্রচারযন্ত্রগুলিকে উপেক্ষা করাই আজ আমার কাছে একটা গোড়ার

কথা বলে বোধ হয়। উপেক্ষার আগে এই প্রচারযন্ত্রগুলি সম্বন্ধে একটা কথা আমাদের বুঝে দেখা উচিত। এগুলিকে 'নেহেরু-মার্কসবাদী' প্রচারযন্ত্র বলা যায় এবং এক হিসাবে ঐ দো-আঁসলা মতবাদ (হিন্দুর পক্ষে) প্যান-ইসলাম বা মিশনারী খ্রীস্টানির চেয়েও বিপদজনক। অর্ধশতাব্দী ধরে হিন্দুর ভাগ্যে যে নির্যাতনের পালা শুরু হয়েছে তার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ইসলামেরও নয়, খ্রিস্টানিরও নয়। ৪৫ বছর ধরে এই পালার সূত্রধার হয়ে আছে দেশের হিন্দুনামধারী নেতারাই এবং ঢাকবাজানো মিথ্যা প্রচারের দ্বারা ঐ নির্যাতনের বোধকে অসাড় করে রেখেছে এদেশের হিন্দু পরিচালিত প্রচারযন্ত্রগুলোই। ঐ দুই প্রতিষ্ঠানই যেহেতু নেহেরু-মার্কসবাদী' কাজেই নেহেরু-মার্কসবাদকেই হিন্দুর চরমতম অভিশাপ বলা উচিত। আমিও একথা অস্বীকার করি না—কিন্তু আমার কাছে এই তিক্তসত্যের একটা কৌতুকের দিক আছে, সেইজন্য এদের উপেক্ষা করার উপরেই আমি জোর দিই। আমি দেখতে পাই, নেহেরু-মার্কসবাদীরা যে ডালের উপর বসে আছে ৪৫ বছর ধরে সেইটেই তারা একটু একটু করে ছেদন করছে এবং তার সহজলভ্য ফলগুলি নিজেদের ভোগে লাগালেও প্রাংশুলভ্য শাখাগুলির সঙ্গে সঙ্গে গোটা গাছটাকেই ফলোন্মুখ করে তুলেছে প্যান-ইসলাম এবং রঙরুটি খ্রীস্টানির ভোগে লাগাবার জন্যই। এভাবে দেখলে বোঝা যায়, নিজেদের চিতার আগুন তারা নিজেরাই প্রজ্জ্বলিত করছে। নেহেরু-মার্কসবাদীকে যারা মানবধর্ম (humanism) বলে প্রচার করে তাদের সম্বন্ধে একথা আরো বেশী সত্য। যারা বলে আমরা 'হিন্দু' নই আমরা 'মানুষ'—তারা তাদের অন্ধ হিন্দুবিদ্বেষের ফলে এদেশে মানবধর্মের অন্ত্যোষ্টি-ক্রিয়ার সবচেয়ে বড় শ্মশানবন্ধু হয়েছে। এইজন্য এদেরকে আমি শেষ পর্যন্ত প্যান-ইসলাম বা মিশনারি খ্রীস্টানির মতো বিপদজনক ভাবি না—এরা শেষ পর্যন্ত অনুকম্পার পাত্র। সারা বিশ্বজুড়ে আসল মার্কসবাদের ধরাশায়ী অবস্থা আজ আমরা চর্মচক্ষেই অবলোকন করছি কাজেই নেহেরু-মার্কসবাদের মতো তার বিবর্ণ সন্ততির কৃত্রিম ও প্রচার-যন্ত্রদৃষ্ট রক্তাভা দেখে আমাদের বিচলিত হবার কারণ নেই। ঐ রক্তাভা পূর্বদিগন্তের নয় পশ্চিম দিগন্তের, খুব সম্ভব অচিরেই তা নিরাময়যোগ্য দুষ্টক্ষতের মতো পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু অর্ধশতাব্দীব্যাপ্ত রাক্ষসী বেলায় সে হিন্দু সমাজের বুকে যে বৃহত্তর ক্ষতের সঞ্চার করেছে তার নিরাময়ের জন্য হিন্দুকে আজ জীবনসর্বস্ব পণ করতে হবে। আমার মতো লোক হিন্দুজন্মের গৌরব ঘোষণা করতে পারে না বটে, কিন্তু ওই গুরুদায়িত্ব পালনের ডাক সেও দিতে পারে।

সুহাস মজুমদার

বিষয়সূচী

।। এক।।

যারা বলে আমরা 'হিন্দু' নই, আমরা 'মানুষ'

যারা বলে ঃ আমরা 'হিন্দু' নই, আমরা 'মানুষ',—জন্মসূত্রে তারা সবাই হিন্দু। জন্মসূত্রের হিন্দু না হলে এই শ্লোগানটায় কোনো ধার থাকত না,—মুসলমান বা খ্রিস্টান কোনোদিন 'হিন্দু নই' আওয়াজ তোলার দরকার বোধ করেনি। এখন এই যে 'হিন্দু-নই' বুলি হাঁকানো হিন্দুর দলে এদের মধ্যে সৎ মানুষের সংখ্যা বড় কম নয়। 'হিন্দু' নামটার বিরুদ্ধে তাদের বিরক্তি আমরা সম্পূর্ণ অকারণ বলতে পারি না। আমি যতদূর বুঝেছি, 'হিন্দু' শব্দটাকে তারা হরিজনহত্যা, বধূহত্যা প্রভৃতি পাপের সঙ্গে যুক্ত করে, পূজো-আর্চায় তারা বিশ্বাস করে না, মন্দির-মসজিদ সম্বন্ধে তারা বীতশ্রদ্ধ এবং সর্বমানবের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে তারা সর্বদাই ঢলঢল করে। এই সৎ মানুষগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি করা যায় না। কিন্তু তারা যখন 'হিন্দু নই' কথাটাকে সভাসমিতিতে, খবরের কাগজে এবং পথেঘাটে একটা গর্জনশীল প্রোপাগান্ডার আকারে উপস্থিত করে তখন দুয়েকটা স্পষ্ট কথা না বলে পারা যায় না।

দুয়েকটা স্পষ্ট কথা

প্রথমত, 'হিন্দু নই' গর্জনটা তারা সবাই হিন্দু সমাজের ভিতরেই আবদ্ধ রাখে, কখনো মুসলমান সমাজের ভিতরে 'মুসলমান নই' বা খ্রীস্টান সমাজের ভিতরে 'খ্রীস্টান নই' গর্জনে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করে না। তা তো করেই না, বরঞ্চ মাদার টেরেসার মতো ধর্মান্ধ মানবসেবিকার ধর্মান্ধতার দিকটা সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে তারা সর্বদাই 'মা' 'মা' বলে ঢাক বাজাতে থাকে। এই জীবধাত্রী মা জননীকে 'ধর্মান্ধ' বলে চিহ্নিত করলে অনেকে গরম হয়ে উঠবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাটা মিথ্যা নয়। ১৯৮৭-৮৮ সালে মাদার ভ্যাটিকানে গিয়েছিলেন, সেখানে দুয়েকজন শ্বেতাঙ্গ তাঁকে অনুরোধ করে ঃ আপনি এতদিন ভারতে আছেন, বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বলুন। মাদার ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দেন ঃ ছি ছি, যীশুর সঙ্গে তোমরা বেইমানি করছ।—অ-খ্রীস্টানের পক্ষে এরকম মা বোধ হয় সৎমাও নয়, কিন্তু 'হিন্দু নই' ক্লাবের সভ্যরা এযুগে এই মানুষটাকে তাদের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের দেবতা হিসাব দেখতে শুরু করেছে। এর মধ্যে যে এক-চোখোমি আছে তা একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। বিনোবা ভাবে ছিলেন হিন্দু মানবসেবক—সেইসঙ্গে তিনি সর্ব-ধর্ম -সমভাবের এক মস্ত বড় প্রচারকও ছিলেন বটে। তিনি শুধু খ্রীস্টান শাস্ত্রই প্রচার করেন নি, কোরান শাস্ত্রকেও কাফেরমুক্ত করে প্রচার করতে তাঁর বিশেষ যত্ন ছিল। সরলচিত্ত বিনোবা ভাবে জানতেন না, সারা পৃথিবীকে কাফেরমুক্ত না করে কোরানকে কাফেরমুক্ত করা যায় না। কিন্তু যেদিক দিয়েই দেখা যাক, 'হিন্দু নই' ক্লাবের সভ্যদের কাছ থেকে অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রবক্তা হিসাবে সমাদৃত হওয়ার দাবি তিনি অনায়াসেই করতে পারতেন। অথচ

আমরা সবাই জানি, মাদারকে 'মা' 'মা' বলে গড়াগড়ি খায়, বিনোবাকে তারা কখনো 'বাবা' 'বাবা' বলে ঢোল বাজায়নি।

আরেকটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তাদের মাতৃত্ববোধের মতো ভ্রাতৃত্ববোধেও মস্ত ফাঁকি আছে। মাদার টেরেসাকে যারা বন্দে মাতরমের দেবতা সাজিয়েছে, তাদের ভ্রাতৃত্ব বিশেষভাবে মুসলমান-খ্রীস্টানকেই আশ্রয় করে—এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকদিনের। আপাতদৃষ্টিতে এটা অস্বাভাবিক নয়, কেননা, 'আমরা হিন্দু নই' কথাটার সোজা অর্থ হচ্ছে 'আমরা কোনো হিন্দুর ভাই নই'। কিন্তু গোলযোগ দেখা দেয় তখনই, যখন 'আমরা হিন্দু নই' কথাটার সঙ্গে তারা 'আমরা মানুষ' কথাটা জুড়ে দেয়। তখন ঐ একচোখামির মানে দাঁড়ায় 'হিন্দুর আদতে মানুষই নয়, তারা জন্তু বিশেষ'। কোরান শাস্ত্রে এই ধরনের কথা দুষ্প্রাপ্য নয়। সেখানে বলা হয়েছে 'পৌত্তলিকরা জঘন্যতম জন্তু' (কোরান ৯৮/৬)। প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশের হিন্দু-নই-পন্থীরাও কি তাই বলতে চায়?

অসাম্প্রদায়িক মানবতা

'আমার দেবতা হিন্দুর দেবতা নয়, মুসলমানের দেবতা নয়, আমার দেবতা সর্বমানবের'। এই ধরনের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও পেয়েছি,—যে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের 'হিন্দু নই' ক্লাব থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজেকে সারা জীবন 'হিন্দু' বলেই পরিচয় দিয়ে গেছেন। কাজেই ওরকম উক্তির মধ্যে যে একটা গভীরতর সত্য আছে সে কথায় অবিশ্বাস করতে চাই না। ফলে আমার আপত্তিটাও 'হিন্দু-নই'-ওয়ালাদের সর্বমানবিক মানবতার বিরুদ্ধে নয়—আপত্তি তাদের সর্বমানব-কল্পনার সঙ্কীর্ণতা নিয়ে। আমি যতদূর বুঝি, সর্বমানবিক মানবতা বিশেষভাবে নির্যাতিত ও আর্তমানুষের জন্যই জরুরি, কিন্তু হিন্দু-নই-পন্থীরা তা ভাবে না। তাদের সর্বমানব-তত্ত্ব শুধু হিন্দুদেরকেই বাদ দেয়, অথচ তারা বেশ জানে, বর্তমান বিশ্বে কোনো একটি মাত্র মনুষ্য-গোষ্ঠীকে যদি নির্যাতিত বলতে হয় তবে তা হিন্দুসমাজেরই বলা উচিত। এই সমাজের কোনে রক্ষক-রাষ্ট্র নেই, এমন কি ভারত সংবিধানও এদেশের 'protected religion' বলতে মাইনরিটি religion-গুলিকেই স্বীকার করেছে। সংবিধান এই 'মাইনরিটি' রিলিজিওয়ান'গুলির নাম বলেনি কিন্তু প্রত্যেকেই জানে সংবিধান প্রদত্ত protection-এর ব্যবস্থাপুঞ্জকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগিয়েছে ইসলাম ধর্ম আর খ্রীস্টান ধর্ম। এই দুটি ধর্মের চাপে হিন্দুর ধর্মকর্মের আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। গরীব লোকের হিন্দুধর্ম পেট্রোডলার, মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ স্টার্লিং ও জার্মান মার্ক—সর্বোপরি সেকুলার সরকারের সরকারী অনুদানের দ্বারা পরিপুষ্ট 'মাইনরিটি' ধর্মগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। এই 'রক্ষিত' ধর্মগুলি যে হিন্দু সমাজকে 'ভক্ষিত' করতে চায় সে উদ্দেশ্য তারা বড় একটা চেপেও রাখেনি। বিধর্মীর কাছে হাজার বছরের লাঞ্ছনার পরেও হিন্দু আলো সর্ব-ধর্মসমভাবের বোল ছাড়েনি,—কিন্তু নির্বোধ হিন্দু যাকে 'মা' 'মা' বলে জড়িয়ে

ধরতেচায় সেই মা-মিশনারি ক্রুদ্ধ ছি-ছিক্কারের দ্বারা বোঝা গেছে খ্রীস্টানের কাছে সর্ব-ধর্ম-সমভাবের গুরুত্ব কতখানি? ইসলাম ঐ সমভাবের জবাব দিয়েছে আরো স্পষ্ট করে। হিন্দুর পবিত্রতম তীর্থস্থানগুলির উপর সে তার দখলদারির চিহ্ন বজায় রাখবার জন্য ইদানীং একটা যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেছে। তাইতেই কি সে ক্ষান্ত হয়েছে? দু'হাজার বছর ধরে ইহুদীদের বলা হত wandering Jew। আজকের ভারতে এবং আজকের পৃথিবীতে এই নাম ঘুরে গেছে হিন্দুর দিকে—হিন্দু আজ তার নিজের বাসভূমিতেই wandering Hindu-র থেকে সিংহল থেকে, পাঞ্জাব থেকে এবং কাশ্মীর থেকে। বাঙালী হিন্দু বিতাড়িত হচ্ছে আসাম থেকে, ব্রাহ্মণ হিন্দু বিতাড়িত হচ্ছে তামিলনাড়ু থেকে সম জাতের হিন্দু বিতাড়িত হচ্ছে ভারতের প্রত্যেকটি মুসলিম-গরিষ্ঠ পল্লী বা মহল্লা থেকে। 'হিন্দু-নই'-ওয়ালার মানবতা কখনো এই wandering Hindu-র জন্য নয়। মুসলমান-খ্রিস্টানের মধ্যে ঢালাও হাতে বিতরণ করতে গিয়ে তার মানবতার পুঁজি শূন্য হয়ে যায়। 'মানবতার' এই বিচিত্র ব্যাখ্যা আজকের ভারতের এক অভূতপূর্ব জিনিস। এ জিনিস পাশ্চাত্ত্যে নেই, এশিয়ার আর কোন দেশে নেই, ভূ-ভারতের আর কোনো অঞ্চলেই নেই। আমার আপত্তি এইখানেই।

'হিন্দু-নই'-ওয়ালাদের পাশ্চাত্ত্য প্রতিরূপ

বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখা একটি বই-এর নাম 'Why I am not a Christian ?' গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্ত্যে এরকম বই খুব কম লেখা হয়নি। ভলটেয়ার অনেক দিন আগেই এ ব্যাপারে পথ দেখিয়ে গেছেন। গীবন খ্রিস্টানি আর বর্বরতাকে ভেবেছেন সমপর্যায়ের। টম পেইন লিখে গেছেন, বাইবেলকে 'গডে'র বাক্য না বলে 'ডিমনের' বাক্য বলাই উচিত। কিন্তু এই সমস্ত লেখকের, 'খ্রীস্টান নই' ঘোষণার একটা ইতিহাস আছে। এককালে ওদেশে খ্রিস্টানের সংঘশক্তির হাতে দমন-পীড়নের ক্ষমতা ছিল অফুরন্ত তার মস্ত বড় কাজ ছিল 'স্বাধীন চিন্তা'কে গলা টিপে মারা। গ্যালিলিওর কথা সবাই জানেন। দুঃখের বিষয় এখনকার অবস্থা দাঁড়িয়ে ঠিক বিপরীত। পাশ্চাত্ত্যে আজ খ্রীস্টসংঘের মতো নিরীহ প্রতিষ্ঠান আর হয় না। গোখরো সাপ আজ ঢোঁড়া সাপে পরিণত হয়েছে। তার সমস্ত বীরত্ব আজ এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষগুলির রক্তপান করেই নিঃশেষ হচ্ছে, স্বভূমি থেকে তার দোকানপাট আজ উঠে যাবার মুখে। পাশ্চাত্ত্যে এই ব্যবসাদারি খ্রীস্টানির পতনের বৈরাগ্য-ধর্মী খাঁটি খ্রীস্টপন্থার উদ্ভব সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়

চুরাশি সালে India Today কাগজ মাদার টেরেসাকে 'ইন্টারভিউ' করে প্রশ্ন করেছিল, আজ যদি গ্যালিলিওর সঙ্গে চার্চের বিরোধ নূতন করে দেখা দিত তবে আপনি কোন্ পক্ষে থাকতেন? মাদার এক নিমেষে উত্তর দেন—চার্চের পক্ষে। 'হিন্দু-নই'-ওয়ালাদের "বন্দেমাতরমের" দেবতাকে চিনতে এই উত্তরটা কিঞ্চিৎ সহায়ক হতে পারে।

পাশ্চাত্যের বহু লেখক আজো ভলটেয়ার-গীবনের পরিসমাপ্ত কাজটাই আরো বেশি উগ্রতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে চান, বার্ট্রান্ড রাসেল ঐ দলের লোক। তিনি পাশ্চাত্যের আরো বেশি উগ্রতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে চান, বার্ট্রান্ড রাসেল ঐ দলের লোক। তিনি পাশ্চাত্যের খ্রীস্টসংঘের মতো ঢোঁড়াসাপের বিরুদ্ধে সারা জীবন অনেক হাঁকডাক করে গেছেন কিন্তু এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষের উপর ঐ সংঘের উপদ্রব নিয়ে কোনোদিন কলম ধরেননি। আপন দেশের নির্জীব ও বিপর্যস্ত খ্রীস্টসংঘের উপর তাঁর অনাবশ্যক হাঁকডাক আমাদের দেশের 'হিন্দু নই'-ওয়ালদের ক্রিয়াকর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। তফাত এই যে রাসেলের কিঞ্চিৎ মনীষা ছিল—তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল দিগ্‌বিজয়ী। এদেশের হিন্দু-নই-ওয়ালারা কোনোদিন পাণ্ডিত্য বা মনীষার ধার ধারেনি—তারা রাসেল শ্রেণীর লেখকের খ্রীস্টান-বিরোধিতাকে একেবারে টাট্‌কা-টাট্‌কি তুলে এনে হিন্দু-বিরোধিতা হিসাবে এদেশের মাটিতে চালান করে দিয়েছে। এর মধ্যে নকলবিশীর ছাপ যেন গভীর, কাপুরুষতাও তেমনি গগনস্পর্শী।

কাপুরুষতার কথাটা একটু স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা যোগ্য। চোখ কান যাঁদের খোলা আছে তাঁরা জানেন, এদেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান শত্রু এযুগে হিন্দুত্ব নয়—কোনোকালেই তা ছিল না—আসল শত্রু হচ্ছে বামপন্থী nihilism, মিশনারী খ্রীস্টানি আর জেহাদী ইসলাম। মিশনারি খ্রীস্টানি আমাদের স্কুল-শিক্ষা থেকে বেশী সভ্যতার বাঁধন সম্পূর্ণ আল্‌গা করে দিয়েছে, জেহাদী ইসলাম আমাদের ধর্ম জীবনের প্রত্যেকটি ক্রিয়াকলাপের উপর সেকুলারিজম-এর ছদ্মবেশধারী তুর্কি বর্বরতার ফাঁস বাগিয়ে ধরেছে, আর বামপন্থী nihilism ভারতে প্রত্যেকটি প্রচারযন্ত্র দখল করে নিয়ে আমাদের ঐতিহাসিক স্মৃতির প্রত্যেকটি ধারাকে করছে মসীলিপ্ত। অসাম্প্রদায়িক মানবতার পূজারীরা যে এসব কথা জানেনা তা নয়। কিন্তু এই কাপুরুষের সংঘ কখনো ঐ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলির বর্বরতার প্রতিবাদ করেনি—তারা এখনো 'বধূ হত্যার হিন্দু পাপ', 'হরিজন-হত্যার হিন্দু পাপ' এবং 'জাতিভেদের হিন্দু পাপ' নিয়ে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছে। তারা বেশ জানে, বধূহত্যার ঘটনা ঘটে সমাজের এমন একটা স্তরে যার উপর দাগ কখনো জলের উপর আলপনার দাগের চেয়ে গভীর হয় না[১]; হরিজন-হত্যা ঘটে 'হিন্দু-নই'-পন্থী রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক দলাদলির ফলে[২] এবং জাতিভেদের মারাত্মক 'টেনশন'

১। কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা বধূহত্যার 'কেস' হচ্ছে সুরূপা গুহের হত্যাকাণ্ড। সব কাগজেই ঐ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ ছাপা হয়েছে, কিন্তু কেউই খোলসা করে বলেনি, যে পরিবারে ঐ ঘটনা ঘটে সে হচ্ছে কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা 'হিন্দু-নই'-পন্থী পরিবারের একটি।)

২। হরিজন-হত্যার সবচেয়ে সুপরিকল্পিত ধারা সৃষ্টি হয়েছে লালুপ্রসাদ যাদবের বিহারে। লালু আর মুলায়েম যাদব যাদব-গোষ্ঠীকে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছেন।)

সৃষ্টি হয় রিজার্ভেশন-ওয়ালাদের উৎকট ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের যুক্তিহীন আতিশয্যের ফলে। 'হিন্দু-নই'-ওয়ালারা এসব কথা খুব ভালোভাবেই জানে কিন্তু অসাম্প্রদায়িক মানবতার নামে এসবের জন্য তারা গাল দেয় শুধু হিন্দু সমাজকেই। তারা পাশ্চাত্ত্য ঢং-এর অনুসরণ করে সন্দেহ নেই, এই তা দিয়ে তাদের কাপুরুষতার স্খালন হয় না।

তাছাড়া পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে আমাদের অবস্থার মিলই বা কতখানি? পাশ্চাত্ত্য দেশে আজ খ্রীস্টসংঘীয় বর্বরতার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐ সংঘকে বর্বরতাকে কবে পাশ্চাত্ত্যের উদার ও সুমহৎ সভ্যতার 'ভ্যানগার্ড' হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কোনো আন্তরিক প্রয়াস করা হয়নি। তার ফলে ওদেশে সভ্যতার আদর্শে একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে মাত্র—রাসেল প্রভৃতি লেখক সেই শূন্যতারই প্রতীক। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের বাইরে গিয়ে ঐ বর্বর সংঘ (আফ্রিকা আর এশিয়ায়) একটা নূতন পক্ষ উদগদ করে তার বর্বরতার মেয়াদ বাড়িয়ে নেবার চেষ্টায় লেশমাত্রও বাধা পায়নি। তা ছাড়া পাশ্চাত্ত্যে শুধু সভ্যতার আদর্শেই শূন্যতা এসেছে; কিন্তু কোনো বিদেশী বর্বরতার পদসঞ্চার ঘটেনি। ভারতের চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। খ্রীস্টসংঘের মতো মহাপরাক্রমশালী হিন্দুসংঘ এদেশে কোনোকালেই ছিল না, এমনকি অস্পৃশ্যতার মতো ধর্মধ্বজী মহাপাপের হয়ে লড়াই দেবার জন্য কোনো সম্মিলিত ব্রাহ্মণসংঘও এদেশে কোনোকালেই গড়ে ওঠেনি। উল্টোদিকে স্বাধীন ভারতের উষালগ্ন থেকেই এদেশে জেহাদী ইসলাম এবং মিশনারি খ্রীস্টানি তাদের বর্বরতার সব কয়টি নখদন্ত নিয়ে ভারতভূমিকে গ্রাস করবার জন্য ওত পেতে ছিল। কাজেই 'হিন্দু-নই'-ওয়ালাদের প্রচার এদেশে সভ্যতার ক্ষেত্রে শুধু শূন্যতা সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি—বর্বরতার শক্তিগুলিতেও সে বাড়বৃদ্ধি ঘটিয়াছে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে। ভি. এম. তারাকুণ্ডে নামে এক 'হিন্দু-নই'-ওয়ালা মহাপুরুষ কীভাবে কাশ্মীর প্রদেশের জেহাদী বর্বরতার সহায় হয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ সম্প্রতি কাগজে-কাগজে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জেহাদী মুসলমানের বিরুদ্ধে ওখানকার নামমাত্র পুলিশী ব্যবস্থাতেও প্রতিবাদ জানিয়ে একটা কাল্পনিক রিপোর্ট ফেঁদে প্রচার করেছেন যে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকেরা ওখানকার মুসলিম মেয়েদের সর্বনাশ করতে লেগেছে। আসল ঘটনা অবশ্য এর বিপরীত। জেহাদীদের হাতে হিন্দুর মেয়ের ধর্মনাশ ওখানকার সুপরিচিততম ঘটনা। কোনো মেয়েকে ওখানে বারম্বার gangrape করে চলন্ত গাড়ির চাকায় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউকে খণ্ডে-খণ্ডে কাটা হয়েছে করাত দিয়ে। কারোর পিঠে গরম শিক দিয়ে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' লিখে নিরস্ত্র অবস্থায় পথের মাঝখানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।—উপত্যকা থেকে ৫৩ হাজার হিন্দু পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছাগল ভেড়ার মতো। কিন্তু এ-সমস্তর প্রতিবাদে কোনো 'হিন্দুনই'-ওয়ালা প্রতিষ্ঠানের ঢাকে কাঠি পড়েনি। তারাকুণ্ডের মতো মহাপুরুষের

ক্রিয়াকলাপে বোঝা গেছে, অসাম্প্রদায়িক মানবতার প্রতিনিধিরা এদেশে 'গনিমতী'[১] ও জেহাদী ইসলামের মতো সাম্প্রদায়িক বর্বরতার সঙ্গে হাত মিলিয়েও হিন্দুসমাজকে ধ্বংস করতে চায়। কাজেই Why I am not a Hindu স্লোগানটাকে কোনোভাবেই Why I am not a Christian স্লোগানের প্রতিরূপ বলা যায় না—এদের আপাত সাদৃশ্যের আড়ালে আছে এক মারাত্মক বৈসাদৃশ্য। দ্বিতীয় স্লোগানটা বলা যায় না—এদের আপাত সাদৃশ্যের আড়ালে আছে এক মারাত্মক বৈসাদৃশ্য। দ্বিতীয় স্লোগানটা শুধু পাশ্চাত্ত্য জগতের সভ্যতার আদর্শকেই দিগ্‌ভ্রান্ত করেছে, কিন্তু প্রথমটা দুহাত বাড়িয়ে ডাকছে বর্বরতার অশুভ শক্তিগুলিকে ভারতের বুকে এমন দুর্যোগের দিন কোনকালেই আসেনি।

হিন্দুর হয়ে দুটো কথা বলার বিড়ম্বনা

সবচেয়ে ভয়ের কথা, শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর হয়ে দুটো কথা বলার লোকও আজ দুর্লভ হয়েছে। পণ্ডিত নেহেরুর সময় থেকে হিন্দুর সমাজ-সভ্যতা ও ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে যে তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞা দেশের একনম্বর রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে নিকৃষ্টতম সাংবাদিক পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে থাকে ইদানীং কালে তা 'হিন্দুত্বের' যে কোনে প্রকাশভঙ্গির গলায় যমের-ফাঁস-লাগানো একটা বেড়ির মতো চেপে বসেছে। হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ করতে গেলেও হিন্দু-নই-পন্থীরা আজকাল মার মার শব্দে ধেয়ে আসে। এই প্রবন্ধের লেখক অতি অধম হিন্দু সন্তান, কিন্তু শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে বিশ্বব্যাপী হিন্দু-নির্যাতনের কথা নিয়ে একটু আধটু কুণ্ঠিত আলোচনা করতে গিয়ে আমি নানা সময়ে যে প্রতিকূলতা দেখেছি তার তুলনা হয় না। 'হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই—দেশে এর চেয়ে অনেক বড় বড় কাজ আছে'—এই দাম্ভিক উক্তি মাত্র কয়েক বছর আগেও বাঙালী শিক্ষিত সমাজে সর্বব্যাপক ছিল। 'বড় বড় কাজ' বলতে অবশ্য এঁরা দেশগঠনই বুঝেছেন কিন্তু সেই দেশগঠন কীভাবে হিন্দুদের বাদ দিয়ে হবে—এ প্রশ্নের কেউ জবাব দেবার দরকার বোধ করেননি। অল্পদিন আগেও জবাবের বদলে তাঁরা 'শ্রাগ' করতেন, তাতে অবজ্ঞাও ছিল, অনুকম্পাও ছিল কিন্তু অসভ্যতা ছিল না। অসভ্যতা এসেছে সম্প্রতি। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-কাশ্মীরে এবং সর্বশেষে অযোধ্যায় হিন্দুপীড়নের করালমূর্তি যখন সব লোকের কাছেই প্রকাশ পেয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের 'হিন্দু নই-ওয়ালাদের বাগ্‌ভঙ্গিতে এমন অসভ্যতা এসেছে যা এক ধরনের ক্ষিপ্ততারই নামান্তর। 'সাম্প্রদায়িক হিন্দুগুলোকে গুলি করে মারো, 'গলাধাক্কা দাও', 'চাবুক মেরে সিধা করো'—এই বোল এখন আর উগ্রবাদী

১। কোরানে জেহাদযুদ্ধে দখল করা কাফের মেয়েদের বলে 'গনিমতের মাল'। ইসলাম রাষ্ট্রের বাইরে সব (অমুসলমান) মহিলাই এ অর্থে ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানের চোখে 'গনিমতের মাল' (আরবী গনিমা বা গনিমৎ মানে 'লুটের মাল'।)

রাজনীতির প্রচারকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপেক্ষাকৃত শিষ্টভাষী লোকেরা বলছে—'দেশটাকে হিন্দুরা টুকরো টুকরো করে ছাড়বে', অশিষ্টরা বলেছে—'এরা দেশদ্রোহী, এরা ফ্যাসিস্ট কুকুর, এরা হিটলারের বংশধর।' কেউ জিজ্ঞাসা করছে না, হিন্দুর বিরুদ্ধে এই রকম উগ্রভাষা ব্যবহার ক'রে বিশ্বব্যাপী হিন্দু পীড়নের শক্তিবৃদ্ধি হতে দেওয়া সঙ্গত কি না। শোষিত ও নিপীড়িত নিয়ে এত যে বিলাপ-প্রলাপ তার মধ্যে নির্যাতিত হিন্দুদের কথা কেউ এক লহমার তরেও উচ্চারণ করে না। ঐ বাগ্‌ভঙ্গি এবং এই নীরবতা শুধু কাপুরুষের নয়, এখানে কাপুরুষতার সঙ্গে মিশেছে অমানুষিক হৃদয়হীনতা—'হিন্দু-নই'-পন্থীদের অসাম্প্রদায়িক মানবতার মুখে তা একবস্তা চুনকালি লেপে দিয়েছে। সে কালি ওঠবার নয়, মোছবার নয়, মা-গঙ্গার অনন্ত জলরাশি দিয়েও ক্ষালিত হবার নয়।

কয়েকটা সিদ্ধান্ত

(১) আগেই বলেছি 'হিন্দু-নই'-পন্থীদের জীবনদর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই এযুগে একটা ঢেউ উঠেছে যে, মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীক বা ধর্মাশ্রয়ী পরিচয়টা সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ—মানুষকে তার নিজের বুদ্ধির আলোয় জীবনযাপন করতে দিলেই তার মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ সম্ভব। এই মতের সপক্ষে বা বিপক্ষে যে সব যুক্তিতর্ক উঠতে পারে, সে আলোচনায় এখানে স্থান নেই। কাজেই যাঁরা বলেন 'হিন্দু-নই' পন্থা একটা অসাম্প্রদায়িক মানুষ্যত্বের পন্থা এবং হিন্দু পন্থার চেয়ে উচ্চতর পন্থা তাঁদের সঙ্গে বিরোধও এখানে অনাবশ্যক। এই নির্বিরোধ 'স্বীকৃতি'কে কেউ যদি 'সিদ্ধান্ত' বলতে চান তাতেও আমি আপত্তি করব না।

(২) কিন্তু এই সিদ্ধান্তের অনিবার্য অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, হিন্দুদের মধ্যে যারা 'হিন্দু-নই' পন্থা এবং খ্রীস্টানদের মধ্যে 'খ্রীস্টান-নই' পন্থা চালাতে সচেষ্ট হয়। তারা যেন মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখে, যে-যুক্তিতে হিন্দুত্বকে একটা সঙ্কীর্ণ বা সাম্প্রদায়িক পন্থা বলা হচ্ছে যে যুক্তি খ্রীস্টান-মুসলমান সম্বন্ধে আরো বেশি খাটে। মনুষ্যত্বের আলোচনায় খ্রিস্টানি আর ইসলাম একেবারে গোড়া থেকেই একটা ভাগাভাগি করে নেয়—সে ভাগাভাগি believer আর infidel-এর—'মোমিন' আর 'কাফেরের'। Infidel-এর মনুষ্যত্ব তারা স্বীকারই করে না। কোরান তাদের বধ করতে বলে এবং সারা পৃথিবীর জুড়েই ইসলামী শাসন কায়েম করতে চায়। বাইবেলে বধের উপদেশ তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু ছলেবলে-কৌশলে সমস্ত Infidel-কে খ্রীস্টধ্বজার তলায় জুটিয়ে আনার ব্যাপারে বাইবেলপন্থীরা সম্পূর্ণ একমত। কাজেই যারা শুধু 'হিন্দু-নই' হুঙ্কার দিয়ে আসর মাত করতে চায়, কিন্তু মুসলমান খ্রীস্টানের সামনে থাকে জুজু হয়ে তারা মোটেই অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্বের সহায় নয়—বীরপুরুষ তো নয়ই। তারা আসলে মহাভীরু আর মহাকাপুরুষ।

(৩) বস্তুত অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্ব দিয়ে কোনো সমাজকেই যদি আজ সেবা করতে হয় তবে তা হিন্দুসমাজকেই করা উচিত। কারণ বর্তমান পৃথিবীতে এবং বর্তমান ভারতে তারাই সবচেয়ে নির্যাতিত এ নিপীড়িত গোষ্ঠী। 'আমরা হিন্দু নই, কাজেই হিন্দুপীড়ন নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই'—এরকম উক্তি অসাম্প্রদায়িক মনুষ্যত্বের উক্তি নয়—এটা মহা সুবিধাবাদ এবং মহাকাপুরুষতার উক্তি। কাশ্মীরি হিন্দু বা চট্টগ্রামের চাকমার কাহিনী শুনে যে লোক মর্মপীড়িত না হয় সে আদতে মানুষই নয়, কাজেই তার সম্প্রদায়হীন মনুষ্যত্বের বাহানা একটা তামাসা মাত্র। 'হিন্দু-নই' পন্থীদের মধ্যে যারা সৎ মানুষ, তাদের উদ্দেশে ভারতের হৃদয় থেকে আজ এই কাতর প্রার্থনা উত্থিত হচ্ছে যে, তারা যেন সারা দেশজোড়া এই হিন্দুঘাতী অমনুষ্যত্বের দিকটা একটু তলিয়ে দেখে এবং নির্যাতিত হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক ভাষা ব্যবহার করার একটু থমকে দাঁড়ায়। কাপুরুষতা লজ্জার কারণ বটে, কিন্তু কাপুরুষের মুখে বীরত্বের আস্ফালন তার চেয়েও বেশি লজ্জাকর।

॥ দুই ॥

যারা বলে ঃ ইসলাম শান্তির ধর্ম

এক

এ যুগের ইসলামী বিদ্বানদের সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। একদল প্রাচীনপন্থী, এদেরকে 'মোল্লা' বললেও দোষ হয় না, যদিও এদের পোশাকী নাম হচ্ছে 'উলেমা'। আরেকদল সংস্কারপন্থী বা নব্যপন্থী, এদেরকে 'এ্যাপোলজিস্ট' বলাই সঙ্গত। প্রচীনপন্থীদের ভারতবর্ষীয় 'সেমিনারির' নাম দেওবন্ধ—জায়গাটা উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর জেলায়। এদের ভাবনেতাদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৪-৬২) এবং তস্যপুত্র আবদুল আজিজের (১৭৪৬-১৮২৪) নাম করা যায়। বেরিলির সৈয়দ আহমদকে এদের 'কর্মনেতা' বলা যায় যদিও পয়গম্বরের চরিত্রই এদের কর্ম ও ভাবের আদি অনুপ্রেরণা। এদের লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনো সংশয়ের স্থান নেই। ভারতে এরা ইসলামী রাষ্ট্র স্থাপন করতে চায়, হিন্দুদের প্রাণে না মেরে 'জিম্মি' বা অধমনাগরিক বানাতে চায়, বেশির ভাগ হিন্দুকে বানাতে চায় মুসলমান, দাঙ্গায় বা যুদ্ধে কাবু করা হিন্দুদের বানাতে চায় 'গনিমতের মাল' বা দাসদাসী ও খোজা। প্রতিটি হিন্দু তীর্থস্থানে এরা গোরু কেটে ইসলামী তীর্থ বানাতে চায় এবং হিন্দুর সমস্ত ধর্মকর্মকে ইসলামী 'শির্ক' নাম দিয়ে সমূলে উৎপাটন করতে চায়। এই সমস্তই এরা করতে চায় আল্লার নামে এবং কোরান হাদিসের প্রতিটি বাক্যকে অভ্রান্ত প্রত্যাদেশের স্বীকৃতি দিয়ে। মুসলিম সমাজে এরাই আজো যথার্থ ধার্মিক মানুষ বলে গণ্য—কিন্তু নেতৃত্বের দিক

দিয়ে এদের স্থান ভারতীয় মুসলিম সমাজে আর আর অগ্রগণ্য নয়। নেতৃত্বের ব্যাপারে প্রথম স্থান নব্যদের—উলেমারা বড় জোর দ্বিতীয় স্থানের দাবিদার হতে পারে। পাকিস্তান-সৃষ্টিতে নব্যদের ভূমিকাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এখনো সে অবস্থার কোনো হেরফের হয়নি। এইজন্য নব্যদের কথাই এ প্রবন্ধে বিশেষভাবে আলোচ্য।

দুই

নব্যদের আমি 'এ্যাপোলজিস্ট বলেছি। একথার অর্থ হচ্ছে ঃ আধুনিক যুগের সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার কয়েকটা তত্ত্বকে মৌখিক বা আন্তরিক স্বীকৃতি দিয়ে তারা ইসলামের সপক্ষে, পয়গম্বরের সপক্ষে এবং কোরান হাদিসের সপক্ষে একট সর্বজন মনোহর 'এ্যাপোলজি' বা অজুহাতনামা খাড়া করতে চায়। কোরান হাদিসের কোনো বক্তব্যকেই তারা যুক্তিতর্কের আলোয় প্রত্যাখ্যান করতে চায় না—পয়গম্বর চরিত্রের কোনো দিকেই তারা কোনো খুঁত দেখতে পায় না। কিন্তু প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে তাদের তফাত এই যে, ঐ বক্তব্য ও খুঁতগুলির বিরুদ্ধে তারা আধুনিক সমালোচকদের আপত্তির দিকে নজর দিয়ে সেগুলিকে শান্তি, সাম্যবাদ, উদারনীতি প্রভৃতি বুলির সাহায্যে সমর্থন করতে চায়। ভারতের অতীত ইতিহাসে তুর্কি দস্যুদের প্রত্যেকটি দস্যুকর্মের সপক্ষেই তারা যুক্তির জাল বুনতে চায়, এমনকি মামুদ গজনীর মতো নরপিশাচের সাফাই গাইবার জন্যও তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার বিরাম নেই। ইসলামী রাষ্ট্র তারাও চায়, এমনকি 'জিম্মি', 'জিজিয়া', গনিমতের মাল'—কোনো তত্ত্বকেই তারা বাদ দিতে চায় না। কিন্তু 'জিম্মি' বলতে তারা বোঝে 'ইসলামী রাষ্ট্রের পোষ্যপুত্র', 'জিজিয়া' বলতে বোঝে যুদ্ধের দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়ার 'সম্মানদক্ষিণা' , 'গনিমতের মাল' বলতে বোঝে 'বাস্তুহারা', 'গাজী' বলতে বোঝে 'ধর্মবিজয়ী', 'কাফের' বলতে বোঝে 'দুরাচারী' ইত্যাদি। অবশ্য এই প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই আজগুবি বা অমূলক কিন্তু এরকম ব্যাখ্যা দিয়ে একদল 'এ্যাপোলজিস্ট' চায় হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতে, আরেকদল এরকম ব্যাখ্যা দিয়েই ইসলামের সংস্কার সাধন করতে চায়। নব্যদের মধ্যে যারা একটু বেশি উদার তারা হিন্দুদের 'পোষ্যপুত্র' বা 'সদুপার্জন' বানাতেও কুণ্ঠিত—তারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে হিন্দু-সমাজের সঙ্গে শান্তি-সহবাসেও নারাজ নয়। এদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা উপনিষদের ধর্মকে কোরানের 'সর্বাঙ্গ সম্পন্ন ধর্মের' দিকে একটা 'পদক্ষেপ' বলে মানতেও আপত্তি করে না! এত বড় ঔদার্য কি ভূ-ভারতে কোনোদিন দেখেছি? মুসলিম নারীর অবস্থা-বদলের জন্য এদের অনেকের আগ্রহ অত্যন্ত আন্তরিক, যদিও ওখানেও তার কোরানের বাক্যরাজির একটা আজগুবি ও মনোহর ব্যাখ্যা খাড়া করতে চায়। এদের ভাবকেন্দ্র আলিগড় এবং কর্মনেতা স্যার সৈয়দ আহমদ। পয়গম্বর চরিত্রকে এরা নিখুঁত ভাবে ঠিক, কিন্তু আধুনিক যুগের অনুসরণযোগ্য আদর্শ এরা খুঁজে

পায় কামাল পাশার মধ্যে, গামাল নাসেরের মধ্যে অথবা সাদ্দাম হুসেনের মধ্যে। প্রাচীনপন্থীদের দলের নাম 'জামাত-ই-ইসলামী' কিংবা 'জামাত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ্'। তাদের একটা প্যানইসলামী সংস্থাও আছে তার নাম 'রাবিতা আলমই ইসলামিয়া'। কিন্তু নব্যরা তাদের রাজনৈতিক মুখপাত্র হিসাবে ঐ দলগুলিকে গুরুত্ব দেয় না। তারা তথাকথিত 'সেকুলারিস্ট' দলগুলির সাহায্যেই ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায়।

তিন

এই দুই শ্রেণীর বিদ্বানকে বাদ দিলে ইসলামী বিদ্বানদের মধ্যে তৃতীয় এক শ্রেণীর মানুষ একেবারেই দেখা যায় না। এদেরকে বলা যায় 'উদারবুদ্ধির মুসলমান' অর্থাৎ কিনা সেই শ্রেণীর মুসলমান যারা কোরানের বাণীগুলিকে যুক্তিতর্কের আলোয় পরীক্ষা করে উদার বাক্যগুলি গ্রহণ করতে চায় এবং অনুদার বাক্যগুলি প্রত্যাখ্যান করতে চায়। খ্রীস্টানদের সঙ্গে মুসলমানের এইখানেই একটা মস্ত তফাত, যদিও ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়ে আসলে তারা একই ভাবমণ্ডলের অংশ। পাশ্চাত্যের লক্ষ-লক্ষ খ্রীস্টান আজ বাইবেলের অনুদার বাক্যগুলি কাগজে-কলমে প্রত্যাখ্যান করেছে—কেউ কেউ 'ডিউটেরনমি' প্রভৃতি নরাঘাতী কেতাবকে বলেছে 'শয়তানের বাক্য'। হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা আরো বেশি সত্য। স্মৃতিশাস্ত্রের অনুদার বাক্যগুলি সম্বন্ধে হিন্দুরাও আজ কঠোর সমালোচনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে, অনেকে মনুসংহিতাকে অগ্নিসাৎ করতেও প্রস্তুত*। পৃথিবীতে শুধু মুসলমান সমাজেই কোরান হাদিসের উপর এবং পয়গম্বর চরিত্রের উপর উদারবুদ্ধির আলো ফেলা 'হারাম' বলে গণ্য, কোনো বিদ্বানই সে কাজে এগিয়ে আসেননি। কেন আসেন নি তা একটু তলিয়ে বোঝা দরকার।

আসল কারণ হচ্ছে, গোটা মুসলিম সমাজই একটা 'উম্মা' বা চার্চ,—এই চার্চের শাসন আজো জগদ্ব্যাপী। খ্রীস্টধর্মে চার্চ একট আলাদা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান। হিন্দুদের মধ্যে এমন কোনো প্রতিষ্ঠানই নেই। চার্চের দাপটের দিনে স্বাধীনভাবে খ্রীস্টধর্ম সমালোচনার পথও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—লক্ষ লক্ষ 'হিরোটিক্‌কে' সে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছিল। অজস্র লোকের প্রাণের মূল্যেই চার্চকে দমন করা সম্ভব হয়েছে—তার ফলে এখনকার দিনে বাইবেল সম্বন্ধে যে যা খুশি বলতে পারে। ইসলামে এ জিনিস অকল্পনীয়—'উম্মার' শাসন যে লঙ্ঘন করতে চায়, পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তে বাস করেও সে নিষ্কৃতি পায় না। কোরান হাদিসের যে কোনো বাক্যের প্রত্যাখ্যানকেই ইসলাম শাস্ত্রে বলে 'ইরতিদাদ' (apostasy)—'ইরতিদাসের' শাস্তি হচ্ছে 'কোতল'। ইসলামী

---

* মনুসংহিতায় আগুন দিয়েছিলেন আম্বেদকর। হিন্দুরা এনিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি।

অনুশাসন থেকে বিচ্যুতিকে বলে 'ইলহাদ' (deviation)—কার্যত তারো শাস্তি 'কোতল'। 'উম্মার' এই দাপট অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সালমান রুশদির ঘটনায়। তিনি পয়গম্বর সম্বন্ধে কটূক্তি লিখতে গিয়ে সারা বিশ্বের মুসলমানদের কাছে প্রাণদণ্ডভাজন হয়েছেন—যে কোনো দেশের যে কোনো মুসলমান তাকে কুকুরের মতো হত্যা করতে পারে। এই একটা ঘটনায় দেখা গেছে 'মুরতাদের' (apostate) কোতল নিয়ে শিয়া-সুন্নীতেও মতভেদ হয়নি। এইজন্য মুসলমানের পক্ষে কোরান-হাদিস-পয়গম্বরের স্বাধীন সমালোচনা দুর্ঘটনা, বোধ হয় কোনো কালেই তা সম্ভব হবে না। ইসলামী 'উম্মা' ফ্রি-থিংকারের চারণভূমি নয়। 'কিন্তু এ্যাপোলজিস্টরাও' যে কোরান হাদিসের উপর ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে কোনোদিন সাম্য ও গণতন্ত্রের পথে চালনা করতে পারবে না সে কথাও আজ একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। কেননা ভারতের ইসলামে আজ এ্যাপোলজিস্টদের জয়-জয়কার।

চার

'এ্যাপোলজিস্টদের কারো কারো উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, তারা ইসলামকে অনেকখানি মিথ্যা গৌরব না দিয়ে তাদের মহৎ উদ্দেশ্যটা প্রচার করতে পারে না। এই রকম একটা মিথ্যা গৌরবের উক্তি হচ্ছে 'ইসলাম আদতে শান্তির ধর্ম'। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীনপন্থীরাও এ ব্যাখ্যায় আপত্তি করেনি। তারা খুব ভালোভাবেই জানে, ইসলাম তার শাস্ত্র ও ইতিহাসে বরাবরই যুদ্ধের ধর্ম হিসাবে আত্মপরিচয় ব্যক্ত করে এসেছে এবং ছলে-বলে-কৌশলে* যুদ্ধ জয় করাকেই চিরকাল মহাগৌরবের বিষয় বলে ভেবে এসেছে।** তবু যে প্রাচীনপন্থীরা এ ব্যাখ্যায় আপত্তি করেনি তার কারণ, অনেক নির্বোধ হিন্দু এই মিথ্যা প্রচারকে সত্য বলে মেনে নিয়ে মাইনরিটি তোষণের শিরস্ত্রাণে একটা নূতন ঝালর যোজনা করেছে এবং মোল্লারা সে দৃশ্য দেখে নিজেদের মধ্যে বগল-বাজিয়ে হাস্য-পরিহাস করছে। হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তাদের উদ্যত খঞ্জর এর দ্বারা এক ইঞ্চি পরিমাণও নমিত হয়নি, কিন্তু এক শ্রেণীর হিন্দু যেভাবে এই মিথ্যা প্রচারে যোগ দিয়েছে তাতে তার সঙ্গত কারণেই বাধা দেয়নি। একথা মানতেই হবে, 'এ্যাপোলজিস্টদের সবাই এরকম কুমতলবের দ্বারা চালিত হয়নি, তাদের কেউ কেউই ইসলামকে সত্যি সত্যি শান্তির ধর্ম হিসাবেই দেখতে চায়। কিন্তু শাস্ত্র ও ইতিহাস দুয়ের সঙ্গেই প্রতারণা করে এই যে শান্তি প্রচার, তার বিপরীত ফলটার দিকে তারা নজর করেনি।

---

*হাদিসে আছে war is stratagem—যুদ্ধ হচ্ছে ছলচাতুরী। এটা আওরঙ্গজেবের এক প্রিয় হাদিস।)

** কোরান ৩। ১৯,২০ মৌলানা মোবারক করিম জওহরের অনুবাদ)

পাঁচ

'ইসলাম শান্তির ধর্ম'—এই আজগুবি কথাটার প্রমাণ কী? বলা হচ্ছে আরবি 'সালাম' শব্দের অর্থ শান্তি, এবং ঐ 'সালাম' ঘটিত ব্যুৎপত্তির উপর ভরসা করেই নব্যপন্থী মুসলমানরা এই রোচক মিথ্যাটা প্রচার করতে চেয়েছে। দুঃখের বিষয়, কোরান শাস্ত্রেই 'ইসলাম' শব্দের খুব বিশদ ব্যাখ্যা দেওয়া আছে—সে দিকটার পানে তারা নজর দেয়নি। কোরান পরিষ্কার বলেছে—"**কাফেরনাশী 'উম্মা' গড়ার জন্য দলপতি আল্লার কাছে 'আত্মসমর্পণের নামই 'ইসলাম**"—অর্থাৎ শান্তির সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক দা-কুমড়োর। কোরানের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে : 'নিশ্চয় ইসলাম আল্লার একমাত্র ধর্ম। ...যে আল্লাহার নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করে নিশ্চয় আল্লা তার হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর। অতঃপর যদি তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয় [তাহলে হে মহম্মদ!] তুমি বল 'আমি এবং আমার অনুসারিগণ আল্লার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি'।* ২য় অধ্যায়ে আছে, 'আল্লা তোমাদের জন্য এই দীন (ইসলামকে) মনোনীত করেছেন সুতরাং আত্মসর্মপণকারী না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কোরো না।' এই সমস্ত বাক্যের মধ্যে 'আত্মসমর্পণকেই' 'ইসলামের' অর্থ বলা হয়েছে এবং সে আত্মসমর্পণ যে বিশেষভাবে কাফেরদের সঙ্গে 'হিসাব' চোকার জন্যই তাও মোটেই অব্যক্ত থাকেনি। কাজেই 'এ্যাপোলজিস্ট'রা যে ব্যুৎপত্তি সহায্যে ইসলামকে 'শান্তির ধর্ম' বলে ব্যাখ্যা করতে চায় তা মোটেই কোরান সম্মত নয়। 'এ্যাপোলজিস্টরা' এই ব্যাখ্যার সাহায্যে ইসলামকে কোনোদিন শান্তির পথে চালনা করতে পারবে বলে বিশ্বাস করা যায় না—খোদ কোরান শাস্ত্রও তা চায়নি। কোরানের ইসলাম ব্যাখ্যার মধ্যে আল্লার রক্তচক্ষু মোটেই গোপন থাকেনি।

তাছাড়া 'এ্যাপোলজিস্টদের দেওয়া ব্যুৎপত্তিটাও যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। স্পষ্ট বোঝা যায়, 'ইসলাম' আর 'মুসলিম' শব্দের মূল একই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত D. S. Margoliouth-এর মতে মুসলিম' শব্দের আদি অর্থ হচ্ছে 'বন্ধুকে শত্রুর হাতে সমর্পণকারী'। মার্গোলিওথের মতে কোরেশরাই প্রথম মহম্মদের অনুগামীদের উদ্দেশ্যে এই গালাগালির ভাষাটা ব্যবহার করতে শুরু করে, মহম্মদ বুদ্ধি করে 'সমর্পণের অর্থটা ঘুরিয়ে দিয়ে [আল্লার কাছে] 'আত্মসমর্পণ' অর্থটা প্রচার করতে থাকেন। কাজেই 'এ্যাপোলজিস্টদের দেওয়া ব্যুৎপত্তিটাও শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না**।

'এ্যাপোলোজেটিক্স্'-এর দ্বারা ইসলামে কোনো উদার ভাব বা শান্তি অন্য যাবে কিনা তা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়। আগেই বলেছি, সব 'এ্যাপোলজিস্ট'ই কিছু সাধু উদ্দেশ্যের

---

*কোরান ২। ১৩২)

** Muhammad and the Rise of Islam, page 116 by D.S. Margoliouth. Voice of India. 2.18 Ansari Road, New Delhi-110002)

দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। অনেকেরই মতলব, হিন্দুদের মনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে সারা ভারতকে আরেকবার 'আল্লার পথে' (ফি সবিলুল্লাহ) চালনা করা। বিশেষভাবে আলিগড়ের পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একথা সত্য। আলিগড় থেকে যে 'এ্যাপোলজি'র বইগুলি বেরিয়েছে সেগুলি কোরান হাদিসের 'এ্যাপোলজি' নয়, তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে তুর্কিযুগের ইতিহাস। ঐ নিরবচ্ছিন্ন দস্যুবৃত্তির ইতিহাসটাকে ভারত-ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে ব্যাখ্যা করাই আলিগড়ের পণ্ডিতদের উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য সাধনে ঐতিহাসিক সত্যের উপর যে-কোনো বাটপাড়িতেই তাঁর কুণ্ঠিত হননি। আলিগড়ের 'এ্যাপোলজি' এমন স্তরেও গেছে যে কেউ কেউ অসঙ্কোচে প্রচার করতে শুরু করেছেন : হিন্দুদের যে সমস্ত মা-বোনকে তুর্কি দস্যুরা 'গনিমতের মাল' হিসাবে লুট করেছিল, দস্যু সুলতানদের উপর তাদের 'প্রেম-ভালোবাসার' প্রভাবেই এদেশে হিন্দু মুসলমানের একটা সংস্কৃতি বা Composite Culture-এর পত্তন হয়েছে*। এরকম অশ্রাব্য কথাও এদেশের ঐতিহাসিক মহলে আজকাল অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচিত হতে দেখা যায় এবং এই মহলে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি! যে হিন্দু তার মা-বোনের ধর্মনাশকে Composite Culture-এর মওকা ভেবে উল্লাস করতে যায় তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে চাই না। কিন্তু মুসলমানের মধ্যেও এরকম 'এ্যাপোলজি'র প্রচারে সমাজের সবচেয়ে নিকৃষ্ট অংশটার গর্বান্ধ আত্মগরিমা বিস্তার ছাড়া আর কোনো ফললাভের প্রত্যাশা করা যায় না। আলাউদ্দিন খিলজি বা আওরঙ্গজেব বাদশার কীর্তিকলাপের 'এ্যাপোলজি' পড়ে কোনো মুসলমান সাম্যবাদ, শান্তি ও গণতন্ত্রের পথে আকৃষ্ট হবে,—কোনো মগজী লোক এমনধারা কথায় কর্ণপাত করতে পারে না।

ছয়

আসল কথা, যে পর্যন্ত ইসলামী 'এ্যাপোলোজেটিক্স' থেকে অন্ধ আত্মগরিমার ধারাটাকে পরাস্ত করা না যাবে, সে পর্যন্ত এই ধরণের প্রচারের দ্বারা 'উদার ইসলাম' সৃষ্টির আশা দুরাশা। ইসলামকে যারা শান্তির ধর্মে পরিণত করতে চায় তাদের অত্যন্ত নম্রভাবে স্বীকার করা উচিত, তারা একটা দুরূহ এবং অচিন্তিতপূর্ব আদর্শকেই রূপ দিতে চায়, ইসলামের পুরোনো ইতিহাসে ঐ আদর্শের চিহ্নমাত্রও ছিল না। 'এ্যাপোলোজিস্ট'-এর সংখ্যাই বেশি। মনে রাখতে হবে, সৈয়দ আমীর আলির 'Spirit of Islam' বইটাই আজো ইসলামী

---

* 'The patron saint of India's secularism saw the seed of the composite culture sprouting in the bedrooms of the Muslims to which a lot of Hindu women had been dragged by force.' Sitaram Goel in Story of Islamic Imperialism in India. Voice of India.

গোয়েল বোধহয় পণ্ডিত নেহেরুর কথা বলছেন।)

'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌-এর মহাভাষ্যরূপে গণ্য। অথচ এ বইয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে যে আত্মগৌরবমত্ত হিন্দুবিদ্বেষ প্রচার করা হয়েছে মোল্লাদের কাফের বিদ্বেষের সঙ্গে তার কোনো তফাত নেই। এ বই সারা পৃথিবীর মুসলমান সমাজেই সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু মুজতবা আলির মতো উদারপন্থী 'এ্যাপোলোজিস্ট-এর নাম খুব কম মুসলমানই জানে। মুজতবা আলিও 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' ইত্যাদি আজগুবি তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন, কিন্তু হিন্দুর ধর্মকর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল—তিনি সত্যি সত্যি শান্ত ও উদার ইসলামের পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যর্থ প্রচেষ্টার দ্বারা মর্মান্তিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে ইসলামী 'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌-এর উদার ধারাটা কোনো কালেই জয়শীল হবে না।

সাত

এই প্রসঙ্গে ইসলাম সম্বন্ধে আমাদের 'ডমিনান্ট মাইনরিটি' বা ইংরেজি শিক্ষিত 'এলিটের' ভূমিকাটাও তলিয়ে দেখা দরকার। এই 'ডমিনান্ট মাইনরিটি'কে 'নেহেরু-মার্ক্সবাদী' বলা যায়—এরা ইসলামের মোল্লাবাদী ধারা এবং আত্মগরিমামত্ত 'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌'-এর ধারাকেই স্বীকার করে, উদার ধারার 'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌'-কে তারা কোনোদিন আমল দেয় না। কেন দেয় না তার যুক্তি বড় বিচিত্র। অনেকে বলেন, ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই তারা এ কাজ করে, কেননা এদেশের মুসলিম ভোট নাকি মোল্লাদের আঁচলেই বাঁধা আছে। কথাটা একেবারেই আনুমানিক, কিন্তু এ অনুমান যদি সত্যও হয়, তবু বলতে হয় এ ব্যাখ্যা অত্যন্ত আংশিক। আসল কথা, আমাদের 'ডমিনান্ট মাইনরিটি'র হিন্দুবিদ্বেষ, কাঠামোল্লাদের কাফের-বিদ্বেষের চেয়েও তীব্র। এরা দেশ থেকে সমস্ত হিন্দু ভাবধারাকে বিদায় করতে চায়, হিন্দুর শ্রদ্ধাভাজন প্রত্যেকটি বস্তু ও তত্ত্বকেই উৎসাদন করতে চায়—এত বিদ্বেষ আওরঙ্গজেবের মধ্যেও ছিল না। সীতারাম গোয়েলের যে উক্তি আমি আগে উল্লেখ করেছি তা যদি পণ্ডিত নেহেরুকে বুঝিয়ে থাকে তাহলে বলতে হয়, হিন্দু-মুসলিম মিলনের স্বার্থে হিন্দুর মা-বোনকে তুর্কির হাতে তুলে দিতেও তাঁর আপত্তি ছিল না! এর মধ্যে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে তা এদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে প্রায় সর্বসাধারণ এবং এক শ্রেণীর মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকের মধ্যে অতিমাত্রায় সুলভ। ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এই নেহেরু-মার্ক্সবাদীরাই ভারতের মুসলমান সমাজে উদার ভাবধারা প্রচারের সবচেয়ে বড় বাধা; তারা খুব ভালোভাবেই বোঝে, মুসলমান সমাজে উদার ভাবধারার প্রচার হলে দেশ থেকে হিন্দুর সভ্যতা-সংস্কৃতি উৎসাদনের কাজটিকে তাদের সবচেয়ে শক্তিশালী auxiliary বাহিনীর সাহায্য থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তারাই উদারপন্থী 'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌-কে এদেশের মুসলিম সমাজে স্থান করে নিতে দেয়নি।

তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, এই 'ডমিনান্ট মাইনরিটি' শুধু হিন্দুর পক্ষেই বিপদজনক নয়—মুসলমানের পক্ষেও সমান বা ততোধিক বিপদজনক। হিন্দুর বিপদ এখানে আলোচ্য নয়,—ইসলামকে যারা আন্তরিকভাবে শান্তির ধর্মে পরিণত করতে চায় তাদের অসহায়তার উপরেই আমি জোর দিতে চাই। তারা কিভাবে এই সমস্ত মারাত্মক বাধা কাটিয়ে উদারতার ধারাকে মুসলিম সমাজে জয়শীল করতে পারে, সবশেষে তা নিয়ে দু-একটা কথা বলব।

আট

প্রথম কথা এই যে, 'এ্যাপোলোজেটিক্‌স্‌'-এর সাহায্যে ইসলামকে কোনো নূতন পথে চালনা করা যাবে—উদারপন্থী মুসলমানরে দিক থেকে এ বিশ্বাস একেবারে ত্যাগ করাই উচিত। কোরান-হাদিসের মিথ্যা ব্যাখ্যা দিয়ে নূতন সত্যের জয়স্তম্ভ গড়ার আশা দুরাশা। কিন্তু একথা যদি ছেড়েও দিই, তবু আমীর আলি শ্রেণীর ধর্মান্ধ 'এ্যাপোলোজিস্ট' -এর সঙ্গে কোনো উদারপন্থী 'এ্যাপোলোজিস্ট' কোনোদিন পাল্লা দিতে পারবে বলে বোধ হয় না। কাজেই 'সাম্যবাদ', 'বিশ্বভ্রাতৃত্ব', 'গণতন্ত্র' প্রভৃতি ধ্যানধারণার অসাম্প্রদায়িক ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উপরেই মুসলমান বিদ্বানদের জোর দেওয়া উচিত এবং রোজা-নামাজ-হজ-জাকত-এর বাইরে কোরান হাদিসকে তাদের পাশ কাটিয়ে চলাই উচিত। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া উচিত মুসলমানের জন্য মাদ্রাসা-মক্তব্যের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাস্ফীতির বিরুদ্ধে। ইসলামী আত্মগরিমার আদি উৎস হচ্ছে ঐখানেই।

দ্বিতীয় কথা এই যে 'জেহাদ', 'দার-উল-ইসলাম', 'জিম্মি', 'জিজিয়া', গনিমতের মাল', 'শির্ক' প্রভৃতি কাফেরঘাতী ধারণার সমালোচনায় এগিয়ে আসার দায়িত্ব বিশেষভাবে হিন্দু বিদ্বানদের উপরেই ন্যস্ত করা উচিত।* মুসলমানের পক্ষে এসব ধারণার সমালোচনায় নিযুক্ত হতে গেলে 'মুরতাদ' (apostate) বলে চিহ্নিত হবার ভয় আছে। এও মনে রাখতে হবে ইসলামের বীভৎস পৌত্তলিক বিদ্বেষ থেকেই ঐ সমস্ত ধারণা আজো ভারতীয় ইসলামের অপরিহার্য আনুষঙ্গিক হয়ে আছে। ভারতীয় ইসলামে জেহাদের লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দু, 'গনিমতের মাল', শব্দের লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুর মেয়ে-বৌ, 'শির্ক' শব্দের লক্ষ্য হচ্ছে হিন্দুর দেবপ্রতিমা ও

---

* (১) জেহাদ মানে বিধর্মীর বিরুদ্ধে 'টোটাল ওয়ার' (২) 'দার-উল-ইসলাম মানে ইসলাম-ধর্মাবলম্বীর একচ্ছত্র রাজত্ব। (৩) 'জিম্মি' মানে বিশ রকম হীনতাযুক্ত অধম নাগরিক। (৪) 'জিজিয়া' মানে ইসলামী তহশিলদারের কাছে নতজানু হয়ে প্রদেয় প্রাণরক্ষার কর। (৫) 'গনিমাতের মাল' মানে জেহাদে পাওয়া লুটের মাল যার মধ্যে কাফেরের মেয়ে-বৌকেও ধরা হয়। (৬) 'শির্ক' মান ইসলামের চোখে সবচেয়ে ঘৃণিত মহাপাপ প্রতিমাপূজা। এই মানেগুলি শাস্ত্রীয় এবং ইতিহাস সিদ্ধ। আধুনিক এ্যাপোলোজিস্টরা' এই আরবী শব্দগুলির প্রত্যেকটির জন্যই যে সমস্ত উদার মানে খাড়া করেছে সেগুলি সবই মনগড়া—figment of their imagination.।

মন্দির, 'দার-উল-ইসলামে'র লক্ষ্য হচ্ছে ভারত রাজনীতিতে হিন্দুর স্থান। হিন্দুরা যদি আজো এসব সমালোচনায় এগিয়ে না আসে তবে তাদের গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত।

একথা কোনোমতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, ভদ্র ও ভাবুক মুসলমানরা সারা বিশ্বব্যাপী আদি ও অকৃত্রিম ইসলামের—যাকে বলা যায় Islam red in tooth and claw—সেই ইসলামের গর্বিত পুনরুত্থান এবং তার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে সজাগ নন। আজকের আরব দুনিয়ায় ইসলাম প্রতিনিয়ত মার খাচ্ছে, মূল ভূখণ্ডে সে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে প্রতিনিয়ত মুখ থুবড়ে পড়ে ধরাশায়ী হচ্ছে। এই সঙ্কট থেকে ভারতীয় মুসলমানরা—অন্তত বিদ্বান মুসলমানরা—কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেননি, একথা বিশ্বাস করা দুরূহ। একথা মানতেই হবে আজকের ভারতরাষ্ট্র এশিয়ার তথা সারা পৃথিবীর 'soft underbelly' কাজেই বহু মুসলমান যে ঐ underbelly-তে একটা বল্লম ঢুকিয়ে দেবার আশায় উন্মত্ত হয়ে উঠবে এ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু সব মুসলমানকে আমি বল্লমধারী ভাবতে প্রস্তুত নই। কাফের হিন্দুর জানমাল সম্বন্ধে যাদের লেশমাত্র অনুকম্পা নেই তারাও নিশ্চয় বিশ্বরঙ্গমঞ্চ জুড়ে এ যুগের ইসলামের রক্তাক্ত পরাভব সম্বন্ধে অজ্ঞ নয়। কে বলতে পারে, এই পরাভবের উপলব্ধিই তাদেরকে একদিন উদার ইসলামের ভাবে অনুপ্রাণিত করবে না? সেই ভাবী দিনের প্রভাতসূর্য আজো আমাদের কাছে দৃশ্যমান নয় ঠিকই, কিন্তু যে মুসলমান বিদ্বান আধুনিক সভ্যতার উদার দিকগুলির প্রতি শ্রদ্ধাশীল তেমন লোকের সংখ্যা আজো নিশ্চয় শূন্য নয়। তাদের মহাভ্রান্তি এই যে, 'এ্যাপোলোজেটিক্স্'-এর সাহায্যেই তারা ইসলামকে তার বর্বরতার ইতিহাস থেকে মুক্ত করতে চায়। তাদের উদ্দেশ্যের সাধুতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না, কিন্তু 'ইসলাম বরাবরই শান্তির ধর্ম—এই আজগুবি অন্ধবিশ্বাসের চেয়ে 'ইসলামকে ক্রমশ শান্তির ধর্মে রূপান্তরিত করা যাবে' এই উজ্জ্বল বিশ্বাসের আলোয় উদ্দীপ্ত হওয়াই তাদের পক্ষে আজ অত্যাবশ্যক।

।। তিন ।।

যারা বলে খ্রিস্টধর্মের আদর্শ সর্বজনীন

এক

আমরা যারা খানিকটা ইংরেজি সাহিত্য পড়েছি তারা ইংরেজি-সাহিত্যপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার বীজও আহরণ করেছি। খ্রীস্টের ত্যাগতপস্যাময় ব্রহ্মচর্যের জীবন হিন্দুর কাছে অনায়াসেই সমাদৃত হয়েছে। সে জীবন আমাদের কাছে অচেনা নয়—খ্রীস্টানির সঙ্গে লেশমাত্র পরিচয়ের আগে থেকেই বহু হিন্দু ওরকম জীবনযাপনের

প্রয়াস করে এসেছে। বহু হিন্দু-বাড়িতে এ যুগে খ্রীস্টমাস উৎসবও পালিত হয়, অথচ নিকটতর প্রতিবেশী মুসলমানের কোনো উৎসবে যোগদানের কথা রাজনৈতিক হিন্দু ছাড়া আর কেউ ভাবতেও পারে না। মহরম বা কোরবানির ঈদ হিন্দুর কাছে বিভীষিকা—অবশ্য তার সঙ্গত কারণও আছে। কোরবানির ঈদে গোহত্যার অবশ্যকর্তব্যতা ইসলামের বিধান নয়, কিন্তু গোহত্যার উদ্ধত উপোস ছাড়া ভারতের মুসলমান কোবানির ঈদ পালন করে না। মহরম শোকের উৎসব কিন্তু সেই শোকের সঙ্গে যে উন্মত্ততা জড়িত থাকে তার লক্ষ্য সব সময়েই হিন্দু-সাধারণ। খ্রীস্টানির সঙ্গে ইসলামের এই তফাত শরৎচন্দ্রও লক্ষ্য করেছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ স্বদেশে বিদেশে খ্রিস্টান বন্ধু আমার অনেক আছেন। কাহারও বা পিতামহ কেহ বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু নিজে বইতে ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে সব দিক দিয়া তাঁহারা আমাদের ভাইবোন নয়। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন এতবড় শ্রদ্ধার পাত্রীও আমি জীবনে অল্পই দেখিয়াছি। আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমের মজিয়া ধর্ম ত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটেই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই ঘনিষ্ঠতা আছে একাজ সেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে কাহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনই ঘটে। উগ্রতার পর্যন্ত ইহারা বোধহয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।

দুই

শরৎচন্দ্র যে তফাতের কথা লিখেছেন তা নিয়ে তর্ক চলে না। কিন্তু তিনি পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখেননি। আসল কথা, ভদ্র হিন্দুপরিবার থেকে স্বেচ্ছায় খ্রীস্টান হওয়ার ঘটনা শরৎচন্দ্রের যুগে দুষ্প্রাপ্য ছিল না—কতক হিন্দু ধর্মজিজ্ঞাসার তাগিদেই এক সময় খ্রীস্টান হতে শুরু করেছিল। এদের মধ্যে স্বদেশীভাবাপন্ন লোকও দেখা যেত—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার দৃষ্টান্ত। শরৎচন্দ্র এঁদের কথাই লিখেছিলেন এবং হিন্দু থেকে যারা মুসলমান হয়েছে তাদের মধ্যে এমন লোকের দুষ্প্রাপ্যতার কথাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত হওয়া খ্রীস্টানদের মধ্যেও আরেকটা স্তর ছিল—তাদের কাছে খ্রীস্টানির অর্থ হিন্দু-সমাজের নৈতিক শাসনগুলি থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র, কিন্তু খ্রীস্টের জীবনের আদর্শে নিজের জীবন গড়ে তোলা হয়। হিন্দুসমাজের নীচুতলা থেকে যারা খ্রীস্টান হত তাদের মধ্যে মাতাল ও লম্পটের সংখ্যা কম ছিল না। মিশনারীরা যে খ্রীস্টানি শেখাত এবং আজো শেখায় তাতে হিন্দুধারা থেকে

বেরিয়ে যাওয়ার উপরেই জোর দেওয়া হয়—'খ্রীস্টাননুসরণে'র উপর জোর দেওয়া হয় না।—ছলে বলে কৌশলে খ্রীস্টধ্বজার তলায় রঙরুট জোগানোই যাদের পেশা তাদের কাছে খ্রীস্টানুসরণের মতো ব্যাপার বোধহয় প্রত্যাশা করাও যায় না। এরা হিন্দুসমাজ থেকে ধর্মান্তরিত সাধারণ খ্রীস্টানের মধ্যে হিন্দুধারার প্রতি ঘৃণার শিক্ষা ছাড়া আর কোনো শিক্ষাই দিতে পারে না। এযুগের ধর্মান্তরিত খ্রীস্টানরা সচরাচর এই ঘৃণার শিক্ষাবলেই বলীয়ান। শরৎচন্দ্র যে খ্রীস্টানদের কথা লিখেছিলেন তাদের বংশ এযুগে লোপ পেয়ে গেছে—স্বদেশী থেকে বেরিয়ে যাওয়াই এখানকার খ্রীস্টানদের একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তিন

খ্রীকস্টান ধর্ম এবং তার ব্যবসায়ীরা তাদের রঙরুটের এই যে স্বদেশবিচ্যুতি শেখায় সে ব্যাপারে সারা পৃথিবীর মানুষের আজ সজাগ হওয়ার দরকার আছে। বিশেষ করে এশিয়া আর আফ্রিকায় এই রঙরুটের ব্যবসা আজকের জগতের এক বহুব্যাপক ব্যবসা—আফ্রিকায় এই ব্যবসা নিয়ে পেট্রডলার এবং ইউরোমার্কিন ডলার এক মারাত্মক প্রতিযোগিতায় মেতেছে। যতদুর জানা যাচ্ছে ইউরোমার্কিন ডলার এখানে পেট্রডলারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না, আফ্রিকায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছে খ্রীস্টানের সংখ্যা ছাপিয়ে। এই ব্যবসা এবং ঐ প্রতিযোগিতা ভারতেও ক্রিয়াশীল। এখন পর্যন্ত তাতে ইউরোমার্কিন ডলারেরই জয়জয়কারের কথা শোনা যায়—ঝাড়খণ্ড, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়—সর্বত্রই খ্রীস্টান রাজ্য বসানোর উদ্যোগ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু এ অবস্থা স্থায়ী হবে বলে বোধ হয় না অন্তর্ঘাতী firth column-এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পেট্রডলার এখানে পাকিস্তান-বাংলাদেশের সহায়তায় যে মস্তবড় external subversion-এর কল ফেঁদে বসেছে, মিশনারিদের internal subversion সেই জোড়া subversion-এর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যুঝে উঠতে পারবে বলে বোধ হয় না। মাদার টেরেসার মতো মানবসেবিকা কোনোদিন শাহাবুদ্দিন, ফারুক আবদুল্লা, শাহী ইমাম প্রভৃতি জেহাদী মহাপুরুষের সঙ্গে সমান তালে তাল ঠুকতে পারবেন না। টেরেসা যদিও ঐ ইসলামী ধুরন্ধরদের মতোই রঙরুটের ব্যবসায়ী তবু তাঁর খ্রীস্টান বিবেকবুদ্ধিজনিত দ্বিধাই তাঁকে হার মানাতে বাধ্য করবে। ইংরেজ কবি বোধহয় এটাকেই last infirmity of the noble বলে উল্লেখ করেছেন। মাদার টেরেসার মধ্যে ঐটুকু nobility এবং ঐটুকু infimity বোধহয় আমরা প্রত্যাশা করতে পারি।

চার

এই সম্ভাবনার মধ্যে খ্রীস্টানের পক্ষেও একটা ভাবনার বস্তু আছে—হিন্দুর তো বটেই। হিন্দুর ঘাড়ের উপর যে কালান্তক যমের খাঁড়া ঝুলছে তার বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমি দিল্লীর Voice of India থেকে প্রকাশিত ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বইগুলির উপরে বরাত

দিয়েই আপাতত ক্ষান্ত হব* —কিন্তু এখনকার মতো বলব খ্রীস্টানি আর ইসলামের আরেকটা তফাতের কথা, যা কখনো শরৎচন্দ্রের মাথায় আসেনি। তফাতটা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, মিশনারিরা আমাদের স্বদেশী খ্রীস্টানদের শুধু হিন্দুধারা থেকে ঘৃণাজর্জরিত বিচ্যুতিই শেখাতে পারে কিন্তু দাঙ্গা ও জেহাদের খঞ্জর হাঁকডাক পারে না। ফলের দিক দিয়ে তফাতটা বড় নয়—নাগা-মিজোদের খ্রীস্টান অভ্যুত্থানও খঞ্জর ছাড়া সম্পাদিত হয়নি। কিন্তু দুয়ের মধ্যে নীতির একটা তফাত আছেই। রঙরুটি ইসলাম তার রঙরুটদেরকে নীতি হিসাবেই খঞ্জর চালাতে শেখায় আর রঙরুটি খ্রীস্টানি শেখায় ইসলাম তার রঙরুটদেরকে নীতি হিসাবেই খঞ্জর চালাতে শেখায় আর রঙরুটি খ্রীস্টানি শেখায় স্বদেশী সমাজের প্রতি মর্মান্তিক ঘৃণ্য। এখানে এই তফাতটা বোঝানোই আমার উদ্দেশ্য—কেন না ইসলাম খ্রীস্টানির এই কর্মনীতির তফাত দুদিক থেকেই আধুনিক ভারতে ফলোন্মুখ হবার পথে।

পাঁচ

মিশনারির এই ঘৃণাজর্জরিত স্বদেশাবিচ্যুতির ফল হচ্ছে দেশের প্রতি বেইমানি, যদিও বর্তমান ভারতে এই বেইমানির কোনো নাটকীয় নিদর্শন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। নাগা-মিজোরা তর্ক করে বলতে পারে ঃ হিন্দুরা কোনোকালে তাদের আরণ্যক জীবনধারার উপর উপদ্রব করেনি ঠিকই, কিন্তু মিশনারিদের মতো কোলেও টেনে নেয়নি। কাজেই, তাদের Subversion-কে নাকি বেইমানি বলা যায় না। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নয়, কিন্তু মিশনারির দ্বারা কাউকে কোলে টানা যে আদতে স্বদেশী সমাজের প্রতি বেইমানির দিকে টানা তার এক চমকপ্রদ ও নাটকীয় নিদর্শন কেরল রাজ্যের রাজ্যের ইতিহাসে লুকিয়ে আছে। কেরলের সীরিয়ান খ্রীস্টানরা প্রায় এক হাজার বছর হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে নিরাপদে

* সীতারাম গোয়েল আর রামস্বরূপ আধুনিক হিন্দুর অবিদ্যাগ্রস্ত আত্মাকে মেঘমুক্ত করবার জন্য যে অসমসাহসিক উদ্যমে লিপ্ত হয়েছেন তার তুলনা নেই। রামস্বরূপের The Word as Revelation-এর মতো মহাগ্রন্থ এক হাজার বছরের মধ্যে লেখা হয়নি। ইসলাম-খ্রীস্টানির আক্রমণ সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক লেখাগুলি তাঁরই। Understanding Islam through Hadis, Hinduism vis-a-vis Islam and Christianity-র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসের দিক দিয়ে সেরা বইগুলি লিখেছেন সীতারাম গোয়েল। Hindu Temples what Happened to them-এর দু'ভল্যুম, Story of Islamic Imperialism, Muslim separatism, History of Hindu-Christian Encounters প্রভৃতি বই সব হিন্দুরই অবশ্যপাঠ্য। ভারতে খ্রীস্টানির উপদ্রবের ইতিহাস লিখেছেন এ কে প্রিওলকার এবং ঈশ্বরশরণ। তাঁদের লেখা Goa Inquisition এবং Myth of St. Thomas-এর নাম উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক হর্ষনারায়ণের Myth of composite culture-ও প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য বই। দিল্লীর Voice of India এই সবগুলি বই-এরই প্রকাশক। বেলজিয়ান বিদ্বান্ Koenraad Elst-এর বইগুলির কথা বাহুল্য।)

বাস করেছিল। তারা স্থানীয় হিন্দুসমাজে প্রায় মিশেও গিয়েছিল। কিন্তু মালাবারের পর্তুগীজ আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা স্বদেশী সমাজ ত্যাগ করে পর্তুগীজ দস্যুদের দলে ভিড়ে যায়। এ কাহিনী সুপরিচিত নয়, কে. এম. পানিক্করই প্রথম পুরোনো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে এ ইতিহাস আবিষ্কার করেন, কিন্তু তাঁর বই সাধারণ্যে প্রচার লাভ করেনি। এর মধ্যেও আমাদের কিছু শিক্ষার বিষয় আছে। স্বাধীন ভারতের প্রচার-যন্ত্রগুলি হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে অমূলক কুৎসা রটনায় যতটা তৎপর, ইসলামী ও মিশনারি subversion গুলির সত্যকাহিনী প্রচারে ঠিক ততটাই বিমুখ। যে গোবলিবর্দ-নীতির প্রেরণায় তাদের চালচালন এমন সৃষ্টিছাড়া তাকেই বলে secularism। কিন্তু সেকুলারিস্ট মহাপুরুষদের আপত্তি সত্ত্বেও সীরিয়ান খ্রীস্টানদের কাহিনীটার ব্যাপক প্রচারের দরকার আছে।*

কী সেই কাহিনী? অনভিজ্ঞ পাঠককে প্রথমেই বলা দরকার। ভারতের যে ক্যাথলিক খ্রীস্টান সমাজ মাদার টেরেসা জাতীয় ধর্মব্যবসায়িনীর অক্লান্ত প্রয়াসে এবং হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্রের secularism নামক গোবলিবর্দ-নীতির কল্যাণে শুক্লপক্ষের শশিকলার মতো দিনে দিনে পরিবর্ধমান, তার মধ্যে সীরো-মালাবার, সীরো-মালাঙ্কার এবং ল্যাটিন নামে তিনটি স্তর আছে—ল্যাটিনদের কথা এখানে বিচার্য নয়। আরও একটা দল আছে যারা শুধু নিজেদের সীরিয়ান বলেই সন্তুষ্ট থাকে। এদের সকলের সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে খ্রীস্টশিষ্য সেন্ট টমাসের চেষ্টায় প্রথম শতাব্দীতেই কেরলে এদের একটা সংঘ গড়ে ওঠে। এই কিংবদন্তী অপ্রামাণিক। প্রামাণিক কথা হচ্ছে, চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে 'বাইজেনটাইন খ্রীস্টানির' নির্যাতনের ভয়ে সীরিয়ানরা মেসোপটেমিয়া থেকে পালিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেয় এবং একান্ত পরধর্ম-সহিষ্ণু হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে আপন ধর্ম বজায় রেখে সুখ-শান্তিতে কাল কাটাতে থাকে। ক্রমশ তারা বাহ্যিক চালচলনে হিন্দুসমাজের সঙ্গে মিশে যায়, যদিও আপন ধর্ম ও তারা ত্যাগ করেনি। কে. এম. পানিক্কর প্রামাণিক লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন **Their privileges were most religiously guarded by native Rajas**। যে সমাজে বৈষ্ণব-শাক্ত-শৈব-বৌদ্ধ-জৈন-লিঙ্গায়তরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চিরকাল শান্তি-সহবাস করে এসেছে, তাদের মধ্যে সীরিয়ান খ্রিস্টানদের উপস্থিতি কোনো চাঞ্চল্যের কারণ হয়নি।

চাঞ্চল্য দেখা দেয় এক হাজার বছর পরে, অর্থাৎ কিনা পর্তুগীজ দস্যু ভাস্কো-দা-গামার মালাবার অভিযানের সময় থেকে (১৪৯৮)। পানিক্করের ভাষায়, 'হিন্দু রাজাদের কাছ

---

* গো-বলিবর্দদের সাম্প্রতিক কীর্তি হচ্ছে প্রাচীন বৌদ্ধের উপর প্রাচীন হিন্দুর স্বকপোলকল্পিত নির্যাতনের কাহিনীটা কাগজে-কাগজে জয়ঢাক বাজিয়ে প্রচার করা। বৌদ্ধধর্ম যে ভারত ও মধ্য এশিয়া থেকে তুর্কি বর্বরদের দ্বারাই ধ্বংস হয়েছিল তার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আছে। কিন্তু এদেশের গাভী ও বদলকুলকে সে কথা বোঝানো সম্ভব নয়।

থেকে অতখানি খাতিরযত্ন পাওয়া সত্ত্বেও প্রথম চোটেই সীরীয়ানরা স্বদেশী রাজার আনুগত্য অস্বীকার করে পর্তুগাল রাজের সার্বভৌমতা মেনে নিতে এগিয়ে যায়। Kerala Pazhama'য় ডা গামার সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎকারের বিশদ বিবরণ আছে, সে বিবরণ Faia-র লেখা থেকে সমর্থিত। সীরীয় নেতাদের হাতে যে সমস্ত প্রাচীন দলিল ও গৌরবচিহ্ন (insignia) ছিল সেগুলোও তারা ডা গামার হাতে তুলে দেয়। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা বলে, তাদের মদতে ভাস্কো ডা গামা ঐ হিন্দু রাজ্যটা দখল করতে পারবে—তার জন্য তারা ঐ জলদস্যুকে ক্রাঙ্গোনোরে একটা দুর্গ খাড়া করতে আমন্ত্রণ করে। খ্রীস্টানদের অত খাতিরযত্নে রাখার প্রতিফল হিসাবে এমনিধারা পুরস্কারই হিন্দু রাজাদের পাওনা হয়'। সীতারাম গোয়েল টিপ্পনী করেছেন—হিন্দুরা হাজার বছর ধরে দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছিল।

সীরীয়ান খ্রীস্টানদের এই বেইমানির শেষ পরিণাম কী দাঁড়ায়? গোয়েল জানিয়েছেন, পর্তুগীজরা অচিরেই তাদের উপর রোমান চার্চের শাসন চাপিয়ে দেয়। সীরীয় বিশপরা এতদিন ব্যাবিলন থেকে এসে তাদের যজমানদের দেখশোনা করত—জেসুইট পাদ্রীরা তাতে বিবাদী হয়ে বসে। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'আহাতুল্লা' নামে এক মেসোপটেমীয় বিশপ সীরীয়ানদের 'মেট্রপলিটান' হয়ে ভারতে আসেন—জেসুইটরা তাঁকে জেলে পুরে দেয় এবং ১৬৫৩ সালে গোয়ার ইনকুইজিশনের আদেশে পুড়িয়ে মারে। সীরীয়ানরা তাদের বেইমানির প্রতিফল পায় হাতে হাতে, কিন্তু তা নিয়ে হিন্দুদের কোনো সুখের কারণ ছিল না। পর্তুগীজরা গোয়ার সব হিন্দু মন্দিরই ততদিনে ধূলিসাৎ করেছিল।*

ছয়

বিধর্মী সম্বন্ধে নিকট-প্রতিবেশী খ্রীস্টানদের এই আচরণ-পদ্ধতি বড়ই বিচিত্র। সিরিয়েরা অতীতে যা করেছিল মাদার টেরেসার শিষ্যরাও যে অদূর ভবিষ্যতে তা করবে না এমন কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। কাজেই এ কাহিনীর আলো দিয়েই ইংরেজি সাহিত্য-প্রেম থেকে পাওয়া খ্রীস্টধর্মের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ফুলটা একটু নূতন দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করা উচিত। অল্প বয়স থেকেই আমরা খ্রীস্টধর্মের মূল নীতি জেনেছি, 'সব মানুষ ভগবানের সন্তান'। জেনেছি, বাইবেলের সার কথা হচ্ছে Love God and love thy neighbour। এই নীতির কথা শুধু মিশনারিরা বলে না, প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্ত্য মনীষীই আমাদের এ শিক্ষা শিখিয়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেলের মতো উগ্রবাদী অখ্রীস্টানও নানা প্রবন্ধে Christian love (of mankind)-এর প্রশংসা করেছেন। এ শিক্ষা আমাদের এমনভাবে

---

* পানিক্করের বই আমি দেখিনি। কিন্তু সীতারাম গোয়েল তাঁর Papacy Its Doctrine and History বইটিকে পানিক্করের Malabar and the Partuguese বই থেকে এই বিবরণটা তুলে দিয়েছেন। Papacy বইটি Voice of India-র।

অভিভূত করেছে যে, হিন্দুসমাজের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার পাপকে আমরা এতদিন বিশেষ ভাবে খ্রীস্টানির আলো দিয়েই পরীক্ষা করেছি এবং দারুণ আত্মনিন্দায় নিমগ্ন হয়েছিল। কিন্তু এখনকার এশিয়া-আফ্রিকার মিশনারি-ঘটিত subversion-এর দিকে তাকিয়ে এবং হাজার বছরের প্রতিবেশী-বিধর্মীর প্রতি সিরিয়ান খ্রীস্টানদের এই বেইমানির দিকে নজর করে আমাদের একটা নূতন উপলব্ধির সময় হয়েছে। বলার সময় হয়েছে, খ্রীস্টধর্ম মোটেই সর্বমানবিক নয়। —সর্বমানবিকতার যে তত্ত্ব হিন্দুশাস্ত্রে আছে খ্রীস্টানের children of God তত্ত্ব তার ধারেকাছেও যেতে পারে না। একো দেবঃ সর্বভূতেষুঃ গূঢ়ঃ—এক দেবতা সর্বভূতে বিরাজমান—এর চেয়ে বড় কিছু খ্রীস্টানিতে নেই। আদর্শের ব্যভিচার হিন্দুধর্মেও হয়েছে, খ্রীস্টধর্মেও হয়েছে কিন্তু হাজার বছরের আশ্রয়দাতা প্রতিবেশীর সঙ্গে অসঙ্কোচে বেইমানি করার মতো মহাপাপ আমরা কোনোদিন করিনি। কাজেই আমাদের পাপমুক্তি আমাদের তত্ত্ব দিয়েই করতে হবে, মাদার টেরেসার মতো মিশনারিকে মা মা বলে গড়াগড়ি খাওয়ার বিড়ম্বনা যেন আমাদের না হয়। আমাদের আজ পরিষ্কার করে বলার সময় হয়েছে, পাশ্চাত্ত্যের উদার সভ্যতা বহুদিক দিয়েই আজো আমাদের আদর্শ বটে কিন্তু সে তার খ্রীস্টানির জন্যে নয়।

সাত

আশ্চর্য এই যে, এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত শুধু অমরাই হইনি, পাশ্চাত্ত্যের উদারনৈতিক মনীষীরাও তাঁদের মহৎ সভ্যতায় খ্রীস্টানির যথার্থ স্থান সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো সত্যদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নি। চার্চের রক্তাক্ত ইতিহাসের কথা আজকের পাশ্চাত্ত্যের কোনো মনীষীই অস্বীকার করেন নি। মিশনারিরা যে পাশ্চাত্ত্য সমাজের কলঙ্ক এমনধারা বোধও সে দেশে সুষ্পাপ্য নয়। কিন্তু ওদেশের মনীষীরা প্রায় সব সময়েই খ্রীস্টধর্মকে এই সমস্ত বর্বরতার দায়দোষ করে দেখে থাকেন কাঁটাগাছ থেকে লোক যেমন স্বাদু ফলটাকে সন্তর্পণে তুলে আনে, খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁদের ভাবগতিও ঐরকম। কিন্তু আজকের দিনে এই গোড়ার কথাটাই আরেকবার ভেবে দেখবার সময় হয়েছে।

আসলে খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্রস্থলের বর্বরতার একটা কুটকক্ষ আছে—তার দিকে নজর না দিয়ে চার্চ বা মিশনারির সমালোচনায় কোনো ফল নেই। ঐ ধর্মের মূলীভূত বর্বরতা হচ্ছে ঃ Love thy neighbour তত্ত্বকে সে কোনোদিনই 'হীদনে'দের সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে পারে না। ইসলামে Love thy neighbour ঘটিত কোনো উপদেশই নেই বরং বিধর্মী হলে প্রতিবেশীকেই আগে বধ করার বিধান কোরানশাস্ত্রে খুব স্পষ্টভাবে লেখা আছে (কোরান ৯/১২৩)। কিন্তু এই মস্ত তফাত সত্ত্বেও বিধর্মী-প্রতিবেশী সংক্রান্ত মনোভাবে এই দুই ধর্মের মিল খুবই প্রকট। ইসলাম যেভাবে মানবজাতিকে 'মোমিন' আর 'কাফেরে'

ভাগ করেছে মিশনারিরাও সেভাবে 'খ্রীস্টান' আর 'পেগানের' তফাত করে। 'পেগান' শব্দের ব্যাপক অর্থ যাই হোক না কেন, খ্রীস্টানের কাছে Paganism-এর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে 'পৌত্তলিকতা' (idolatry)। খ্রীস্টানির idolatry আর ইসলামের 'শির্ক্' শব্দের তাৎপর্য একই। ইসলাম এইটেকেই আর খঞ্জর চালনার মস্ত উপলক্ষ্য বলে জানে। খ্রীস্টানশিষ্যেরা তত্ত্বের দিক দিয়ে খঞ্জর-বিমুখ বলে ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে idolatry-র পাপকে পোড়াতে চায়*। বিশেষ করে মিশনারিরা অত্যুক্তিভরা কুৎসার ভাষায় হীদেনদের মধ্যে এই পাপের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে কখনোই বিরত হয় না। কিন্তু শুধুই কি মিশনারিরা? জন্মসূত্রে যারা খ্রীস্টান তারা নাস্তিক হোক বা 'এ্যাগনাস্টিক' হোক, বাল্যসংস্কার ও শিক্ষাগুণে বাইবেলের 'পয়গম্বরী কেতাব'-গুলিকেই আজো নৈতিক জীবনের দিক্‌দর্শন বলে মানে। ঐ কেতাবগুলির আদর্শনিষ্ঠার তিব্রতা অত্যন্ত উচ্চগ্রামের, কিন্তু এও না বলে পারা যায় না যে, জীবনসর্বস্ব পণ ক'রেও প্রতিমাপূজো থেকে বিরত থাকাই তাদের মতে নৈতিকতার চূড়ান্ত মাপকাঠি। ম্যাথু আর্নল্ড পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মূলে দুটি উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন—'হিব্রায়িক' আর 'হেলেনিক', 'হিব্রায়িক' মানে 'পয়গম্বরী'। আশ্চর্যের বিষয়, পাশ্চাত্ত্যের প্রায় সব মনীষীই এই দুই উপাদানকে মেনে নিয়েছেন। চেস্টারটনের মতো চরিত্রমাধুর্য এযুগের কোনো লেখকের মধ্যেই দেখা যায়নি, কিন্তু খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অতি সুন্দর 'এ্যাপোলজির' বইগুলিতেও নৈতিকতার পয়গম্বরী স্তম্ভকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। পয়গম্বরী কেতাবগুলির নীতিনিষ্ঠার কঠোরতা এবং দণ্ডধর ভগবানের প্রতি আত্মসমর্পণের মনোভাব পাশ্চাত্ত্যের উদারনৈতিক মনীষীদের দ্বারাও প্রশংসিত। এই মনোভাবের মধ্যে 'পৌত্তলিক' বিধর্মীর প্রতি সহিষ্ণুতার আশা দুরাশা।

সংক্ষেপে বলা যায়, খ্রীস্টানের স্বদেশবিচ্যুতি ও বেইমানির অভ্যাস তাদের নৈতিকতার মাপকাঠি থেকেই নির্গত হয়েছে। প্রতিমাপূজা-বিরোধিকার নৈতিক কষ্টিপাথর একেবারেই অন্ধবিশ্বাসের কষ্টিপাতর—শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ বা শিব-দুর্গা-বিষ্ণুর উপাসনা কেন প্রতিমাহীন, দণ্ডধর দেবতার পূজার চেয়ে কম নৈতিক হবে তার কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। আগেই বলেছি ইসলামী শাস্ত্রের তুলনায় বাইবেলের পয়গম্বরী কেতাবগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে, সেখানে এই 'মহাপাপের' জন্য নরহত্যার চেয়ে নিজের বিবেকবুদ্ধির উগ্রতাকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা ইসলামে আর খ্রীস্টানিতে যে তফাত

* ঐতিহাসিক দিক দিয়ে খঞ্জরীবিমুখতার কথাটা সত্য নয়। খ্রীস্টানরা শত শত বৎসর ধরে যে সংখ্যায় বিধর্মী কেটেছে, ইসলামের কোতল-কাহিনীর চেয়ে তা কিছু কম রোমহর্ষক নয়। তবে তত্ত্বের দিক দিয়ে খ্রীস্টধর্ম হচ্ছে অহিংসাব্রতী অন্তত যীশুর ধর্ম হচ্ছে বটেই। [অভিজ্ঞ পাঠক জানেন, যীশুর ধর্ম আর খ্রীস্টধর্মে অনেক তফাত আছে।]

এসেছে তা এই ঃ ইসলাম তার অনুগামীদের হাতে বিধর্মী প্রতিবেশীর জন্য খঞ্জর ধরিয়ে দিয়েছে আর খ্রীস্টধর্ম প্রতিবেশী সম্বন্ধে শিখিয়েছে ভ্রুক্ষেপহীন বেইমানির অভ্যাস।

আট

প্রশ্ন উঠবে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার উৎকর্ষ তা হলে কোন্ জায়গায়? ঐ সভ্যতাকেই আজো আমরা আদর্শ সভ্যতা বলে মানি কেন? এ প্রশ্নের সোজা উত্তর হচ্ছে ঃ পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠতা তার খ্রীস্টানিতে নেই, আছে তার পেগান ঐতিহ্যে এবং পেগান জ্ঞানগবেষণার (আধুনিককালীন) অত্যাশ্চর্য বিস্তারে। পাশ্চাত্ত্যের উদারপন্থী মনীষীরাও এ সত্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন ঃ সত্যিকার বড় সভ্যতা ছিল পেগানধর্মাবলম্বী গ্রীকোরোমকদের, তার পরে আসে একটা অন্ধকারের যুগ, পরবর্তীকালে পেগান সভ্যতার পুনরুদ্ধার থেকেই আসে রেনেসাঁস, তারই সঙ্গে ঘটে আধুনিক সভ্যতার নব-নব উন্মেষ-মণ্ডিত ক্রমবিকাশ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক সভ্যতাকে পেগান সভ্যতার পরিপূর্ণতা দেবার জন্য পাশ্চাত্ত্যের কোনো মনীষীই আজ পর্যন্ত সচেষ্ট হননি, গ্রীকধর্মে জ্ঞান ও হৃদয়ানুভূতির আশ্চর্য সমাবেশের উদ্দেশে তাঁরা দূর থেকে নমস্কার জানিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। খ্রীস্টধর্ম থেকে পয়গম্বরী দিকগুলি কঠোরভাবে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র 'অন্ধকারের যুগ' বলে তার অবশ্য সবটাই কিন্তু ভয়ঙ্কর ছিল না—সেন্ট ফ্রান্সিস বা টমাস আ-কেম্পিসের জন্ম হয়েছিল ঐ যুগেই। কিন্তু আধুনিক যুগের খ্রীস্টানির মধ্যে ঐটুকু আলোও বেঁচে নেই—সে ধর্ম এখন ইসলামের মতো একটা নির্ভেজাল রঙরুটের ধর্মে পরিণত হয়েছে, পয়গম্বরী খ্রীস্টানি তার মধ্যে দিয়েছে নৈতিক শ্রেষ্ঠতার চূড়ান্ত আত্মগরিমা। স্বভূমি থেকে সে বিদায় নিতে বসেছে ঠিকই, কিন্তু এশিয়া-আফ্রিকায় তার রঙরুটি পৈশাচিকতা দংষ্ট্রাবিকাশ করেছে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে। যাঁরা ভাবেন মধ্যযুগের তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের উৎকর্ষ শুধু পেগান সভ্যতার উৎকর্ষ নয়, যাঁরা তাঁর মধ্যে খ্রীস্টানিরও কোনো কোনো উৎকর্ষ দেখতে পান, তাঁরা বোধ হয় ঠিক ভাবেন না বা ঠিক দেখেন না। আধুনিক যুগের খ্রীস্টানি মধ্যযুগের তুলনায় অনেক বেশি পয়গম্বর-ধর্মী হয়েছে, সে তার উৎকর্ষের প্রমাণ নয়। আধুনিক প্রোটেস্টান্ট ধর্মের মূলকথা হচ্ছে পয়গম্বরী নৈতিকতা, আধুনিক ক্যাথলিক ধর্মের মূল কথা হচ্ছে রঙরুটি ব্যবসার বিস্তার।

নয়

সবশেষে বলব, খ্রীস্টধর্মের সর্বমানবিকতার দাবি অত্যন্ত অসার, যদিও আলাদা করে খ্রীস্টের দিক দিয়ে সে দাবি হয় তো সঙ্গত। আধুনিক পাশ্চাত্ত্যমনীষার সবচেয়ে বড় ফাঁকি হচ্ছে তার পয়গম্বরী খ্রীস্টানির দাম্ভিকতায় এবং রঙরুটি খ্রীস্টানির অবাধ বাণিজ্য-বিস্তারে।

পয়গম্বরদের দ্বারা পূজিত জেহোভার মতো হিংসুক দেবতার (jealous) পূজা কেন পেগানদের পূজার চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে, আজ পর্যন্ত কোনো পাশ্চাত্ত্য মনীষী তার জবাব দিতে পারেন নি। 'হিংসুটে সদাপ্রভুর'[১] কথা দূরে থাক, খ্রীস্টের প্রেমভক্তিময় 'কাল্ট' কেন এ্যাপেলো বা আথিনীর জ্ঞানোজ্জ্বলিত 'কাল্টের' সহযোগিতায় গৌরাবান্বিত হবে না এ প্রশ্নের জবাবও আমরা আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য ভাবুকের লেখায় খুঁজে পায়নি। ব্যবসাদারি খ্রীস্টানদের কাছে এসব প্রশ্ন তোলা বৃথা, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের মহাগৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার অন্তরাত্মা নিয়ে যাঁরা ভাবনা করেন তেমন খ্রীস্টানের সংখ্যা আজো পৃথিবী থেকে লোপ পায়নি। তাঁদের কাছে খ্রীস্টধর্ম কূটকক্ষশায়ী ঐ শনিগ্রহ সম্বন্ধে 'চেতাবনী' দেওয়ার দরকার আছে। হিন্দুর কাছে ঐ চেতাবনীর গুরুত্ব আরো বেশি, কেননা ইতিমধ্যে রঙরুটি এবং পয়গম্বরী খ্রীস্টানি হঠাৎ 'সোশ্যাল সার্ভিসে'র ছদ্মবেশ ধরে ভারত-সমাজকে ওলট-পালট করার একাগ্র প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হয়েছে[২]। 'চেতাবনীর সময় হয়েছে এই মহাবিপদ সম্বন্ধেও। ভারতের প্রতিটি গৃহছাদ থেকে আজ চেঁচিয়ে বলার সময় হয়েছেঃ 'সাধু সাবধান? তোমার বনাঞ্চলগুলিকে আগুন ধরে গেছে। এখনো যদি সতর্ক না হও তবে এই দাবানল অচিরেই পৌরানলে পরিণত হবে।'

।। চার।।

যারা বলে হিন্দুরাষ্ট্র মানে আদিম যুগে ফিরে যাওয়া

এক

'হিন্দুরাষ্ট্র কথাটার উত্থাপন মাত্রেই দেশের সর্বস্তরে যে গেল গেল রব উঠেছে তাই দেখে বুদ্ধিমান লোক বুঝতে পারছে কথাটার মধ্যে কিছু সার আছে। অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিকতা যখন 'থিওক্রাসি' মধ্যযুগীয় বর্বরতা' প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়া 'সতীদাহ' 'বাল্যবিবাহ'

১। কোরানে আল্লার বিশেষণ হচ্ছে 'আজিজ-উল-ইন্তিকাম'—বাংলায় বলা যায় প্রতিশোধপিপাসু আল্লা'। বাইবেলে গড-এর বিশেষণ হচ্ছে Jealous (His name is Jealous)—বাংলায় বলা যায়, 'হিংসুটে সদাপ্রভু'। দুয়ের মধ্যে অল্পবিস্তর তথাত অবশ্যই আছে—কিন্তু কালেভদ্রে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরাও বাইবেলের দেবতার সঙ্গে শয়তানের সাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়েছেন।)

২। মিশনারিদের কাছে 'সোশ্যাল সার্ভিসে'র তাৎপর্য কী তা নিয়ে মহাত্মার হরিজন পত্রিকায় একটা চিঠি বেরিয়েছিল। পত্রলেখক স্যালভেশন আর্মির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল বুথের একটা বাক্য তুলে দিয়েছিলেন (Social service is the bait but salvation is the hook that lands the fish) মাদার টেরেসাকে হিন্দুভক্তরা যেন এই বাক্যটা একটু প্রণিধান করে দেখেন।)

'অস্পৃশ্যতা' প্রভৃতি কাল্পনিক জুজুর কাল্পনিক মূর্তি খাড়া করে কলমটাকে বল্লমের মতো বাগিয়ে ধরতে শুরু করেছে তখনই বোঝা গেছে তারা এমন একটা সত্যে মুখোমুখি হয়েছে যার সঙ্গে শুধু কলমের লড়াই-এ কাজ হবে না। কলমচির এই বল্লবপ্রীতি আমাদের দেশের একটা আশ্চর্য ঘটনা—এর কার্য কারণ আমাদের তলিয়ে বোঝা উচিত। অনেক দিন আগে 'যুগান্তর' পত্রিকায় সপ্তাহে-সপ্তাহে এক সাংবাদিকের নাম দেখতাম—'এককলমী'। নামটা ইঙ্গিতময়—সাংবাদিকরা যে সাধারণত 'দুকলমী' বা বহুকলমী' হয় ঐ লেখক তা গোপন করেন নি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, লেখক হয়তো আর কিছু অর্থও ভেবে থাকতে পারেন। তিনি হয়তো এইটুকুই ভেবে থাকতে পারেন ঃ আমি শুধু কলমের জোরেই সাংবাদিকতা চালাতে চাই, বল্লম বা কোদাল হাঁকড়ানো আমার ব্যবসার নয়। 'হিন্দুরাষ্ট্র' কথাটার বিরুদ্ধে কোদল হাঁকড়ানোর বহর থেকে আমার সেই সাংবাদিকের কথা মনে পড়ল।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা যেন ভুলেও ঐ কোদাল হাঁকড়ানোর জবাব দিতে না যায়। স্বদেশী আন্দোলনের পর থেকে ভারতের যে কটা হিন্দুসংগঠন গড়ে উঠেছে তারা কেউই 'অস্পৃশ্যতা', 'সহমরণ'* ইত্যাদির ওকালতনামা নিয়ে জনগণের আদালতে সওয়াল করতে হাজির হয়নি, বরং হিন্দু অনৈক্যের প্রতিটি বীজকে নির্মূল করাই তারা তাদের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে প্রচার করে আসছে। 'হিন্দু' নামটার উপর তাদের জোর দেওয়ার মানেও তাই। 'হিন্দু' হচ্ছে সেই পরিচয় বা ব্রাহ্মণ-হরিজনের মধ্যে সাধারণ। অর্ধশিক্ষিত কলমবাজদের বলা বৃথা যে, কোনো গোঁড়া ব্রাহ্মণ কোনোদিন 'হিন্দু' নামে গর্ববোধ করেনি। এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া ১৯শ শতাব্দীর কোনো মনীষীই এই নামকে স্থায়ী স্বীকৃতিদানে দ্বিধাহীন ছিলেন না। 'হিন্দু' আসলে নিপীড়িত ও নির্যাতিতের নাম। ইতিহাসজ্ঞ জানেন তুর্কিযুগেই এই নামের চলন হয়—তুর্কিদের কাছে অধম নাগরিক 'জিম্মি' আর 'হিন্দু' ছিল পর্যায় শব্দ। কাজেই 'হিন্দু' শব্দের উপর জোর দেওয়ার মধ্যেই এমন একটা স্বীকৃতি আছে যে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বিশেষভাবে 'নির্যাতিতের রাষ্ট্র'। যে কলমবাজরা এই গোড়ার কথাগুলিই অস্বীকার করতে চায় তাদের আপত্তির জবাব দেবার দায় হিন্দুরাষ্ট্রবাদীর নয়—তার হাতে এর চেয়ে গুরুতর কাজ আছে। মতলববাজ, বল্লমধারী, 'বহুকর্মী'দের আক্রমণের মোকাবিলার দায়িত্ব তার নয়।

দুই

হিন্দুরাষ্ট্রবাদীরা প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে হিন্দুরাষ্ট্রের ধারণাটা একটু একটু করে ফলিয়ে তোলা—তার সংবিধান তার গড়ন ও তার দণ্ডনীতির পরিচয় দেওয়া—তার কর্মসংস্থা,

* 'সতীদাহ' কথাটা সাংবাদিক সুলভ illiteracy। 'সহমরণ' শব্দটা আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিকদের অজ্ঞাত।)

বিধিবিধানসংস্থা ও বিচারসংস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধের ধারানির্দেশ করা। মনে রাখতে হবে, এই রাষ্ট্রধারাণাটা সম্পূর্ণ নূতন—প্রাচীন যুগের বিকেন্দ্রিত রাজতন্ত্র, আর বর্ণাশ্রমিক কর্মবিভাগের পরস্পরসাপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের তত্ত্ব ছাড়া আর কোনে তত্ত্ব আমরা ঐতিহাসিক পরস্পরাক্রমে পেয়ে আসিনি। কৌটিল্য যে অধ্যক্ষতন্ত্র প্রচার করেছিলেন যে একটা **police state** মাত্র তার মধ্যে হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ খোঁজা বৃথা। উল্টোদিকে আধুনিক হিন্দুরাষ্ট্র যদি প্রাচীন যুগের বর্ণাশ্রমের রক্ষক সাজতে চায় তাহলে হরিজন-ব্রাহ্মণের সাধারণ 'হিন্দু' পরিচয়টা ব্যাহত হবে। নিদেনপক্ষে বর্ণাশ্রমকে যে আগামী দিনে জাতি-নিরপেক্ষ আকারে গড়ে তুলতে হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সবচেয়ে বড় কথা, প্রাচীন সভ্যতারর রাজতন্ত্রমূলক প্রজাপালনের আদর্শকে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের আদর্শের দিকে চালনা করতে হবে—হিন্দুরাষ্ট্রকে হতে হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই সমস্ত নানা উপাদান মিলিয়ে যে অভিনব রাষ্ট্র-পরিকল্পনা, তার একটা সনাক্তযোগ্য আদর্শ আমাদের চাই—সে আদর্শ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। আমিও এখানে অতবড় চেষ্টায় নিযুক্ত না হয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের ন্যূনতম লক্ষণগুলোই উল্লেখ করব। এগুলি হচ্ছে সেই লক্ষণ যা নইলে হিন্দুরাষ্ট্র কিছুতেই 'হিন্দুরাষ্ট্র' পদের বাচ্য হবে না।

তিন

'ন্যূনতম লক্ষণের হিন্দুরাষ্ট্র' হচ্ছে হিন্দুরক্ষার রাষ্ট্র—যে রাষ্ট্রে হিন্দুর জানমাল, ধর্মকর্ম ও সভ্যতা এখনকার মতো দুটি পরধর্ম-গ্রাসী, 'রাষ্ট্র-রক্ষিত' ধর্মের অব্যাহত পীড়নের লক্ষ্যস্থল হবে না,—বলা বাহুল্য আমি ইসলাম ও খ্রীস্টানির কথাই বলছি। তার চেয়ে বড় কথা, '৪৭-এর কুলগ্ন থেকে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামযুগের সাকুল্য ইতিহাসের বিরুদ্ধে, জোর-করে-চাপিয়ে-দেওয়া যে হিন্দুঘাতী বীভৎসতাকে 'নেহেরু-মার্ক্সবাদ' নাম দেওয়া যায়, সারা দেশজোড়া প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তার অনবরত প্রহারের অভিশাপ থেকে সমাজকে রক্ষা করার দায়িত্বও হিন্দুরাষ্ট্রের ন্যূনতম লক্ষণের মধ্যে পড়ে। ঐ পীড়ন এবং এই প্রহারের বাস্তবতা যারা অস্বীকার করে তাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তারা এমন একটা মায়া আয়নার আশ্রয় নিয়েছে যার ফলকে নির্যাতিত হিন্দুসমাজের প্রতিবিম্ব ছাড়া পৃথিবীর আর সব দেশের নির্যাতিতের ছদ্মবেশ ধরে অহোরাত্রব্যাপী আহা-উহু বোলের পাত্র হয়ে ওঠে। হিন্দুর জন্য এই আহা উহু বোলের দরকার নেই, কিন্তু সাংবিধানিক রক্ষাব্যবস্থার দরকার আছে পাকাপাকিভাবে এবং মাসমীডিয়াও শিক্ষাব্যবস্থায় একটা বিপরীত প্রচারধারা গড়ে তোলার দরকার আছে জীবনমরণের প্রশ্ন হিসাবে। এ দুটিই হচ্ছে ন্যূনতম লক্ষণের হিন্দুরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য।

(১) 'ধর্মের অধিকার' প্রসঙ্গে সাংবিধানিক ধারাগুলির উদ্ভট চরিত্রের দিকে এযুগে অনেকের নজর পড়েছে। অনেকেই বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করছেন, মেজরিটির ধর্মরক্ষা সংক্রান্ত

সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করে আমাদের রাষ্ট্র শুধু পরধর্মগ্রাসী মাইনরিটির ধর্মগুলির সুরক্ষার জন্য এবং কোরান বাইবেল-চর্চার জন্য পাকা ব্যবস্থা গড়ে দিতে এগিয়ে গেল কেন? এ প্রশ্নের তথ্য-প্রমাণগত উত্তর যাই হোক না কেন, সংবিধানের ২৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ধারাই বিগত ৪০ বছর ধরে হিন্দুঘাতী ধারা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে।* এই প্রত্যেকটি ধারায় অবলুপ্তি ঘটিয়ে এমন একটা ধারা বসানোর দরকার আছে যে, ভারতরাষ্ট্রের আপন আপন ধর্ম পালন করতে পারবে সব ধর্মের লোকই, কিন্তু রাষ্ট্রীক সুরক্ষার ফলভোগ করবে শুধু হিন্দুরাই (হিন্দু বলতে বৌদ্ধ, জৈন, শিখকেও বুঝতে হবে)। রঙরুটি ধর্মগুলির রঙরুটের ব্যবসা ঐ রাষ্ট্র নিবারণ করবে। মসজিদের জন্য পেট্রডলার এবং মিশনের জন্য পশ্চিমী ডলারের উৎসমুখ রুদ্ধ করবে কঠোর ভাবে, এবং যে ধর্মান্তরিত মানুষগুলি হিন্দু সমাজে ফিরে আসতে চায় তাদের 'পারিবর্তন' পথকে করবে সুগম সহজ ও সুমসৃণ। একটা কথা আমরা একবারও ভেবে দেখি না,—সারা ভারতে নাকি লক্ষাধিক মাদ্রাসা মক্তব আছে। মক্তব পিছু গড়পড়তা বালক-বালিকার সংখ্যা যদি ২০ ও হয় তাহলেও বিশ-লাখ বালক-বালিকা প্রতিদিন কোরানের কাফেরনাশী আয়াতগুলি তদ্‌গত চিত্তে কণ্ঠস্থ করছে। তারা অনবরত আওড়ে যাচ্ছে 'নিষিদ্ধ মাসের পর যেখানে পাবে পৌত্তলিক মারবে, বন্দী করবে এবং ঘাঁটি গেড়ে ওৎ পেতে থাকবে' কোরান (৯/৫)। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মুখস্থ করছে, লড়াই লাগাও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে, যে পর্যন্ত পৌত্তলিকদের দফা শেষ না হয় যে পর্যন্ত আল্লার ধর্ম একেশ্বর না হয় (কোরান ৮/৯৩)। ছন্দোবন্ধে উচ্চারণ করছে ঃ সধবার বিয়ে নিষেধ নেই। (কোরান ৪/২৪)। তারস্বরে আবৃত্তি করছে ঃ মহম্মদ আল্লার রসুল, তাঁর অনুগামীরা বিশ্বাসীদের প্রতি সদয়, কিন্তু অবিশ্বাসীর প্রতি হিংস্র (কোরান ৪৮/২৯)*। বিশ

---

* আমাদের সংবিধানের একটা অনুচ্ছেদের নাম Protection of Minorities, কথাটা আপাতদৃষ্টিতে যত নির্দোষই হোক মাইনরিটির ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মেজরিটির ধর্ম Protection-এর কথা আমাদের সংবিধানে কোথাও বলা হয়নি।)

* এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নির্দোষ ধার হচ্ছে ২৭ নং। এতে বলা আছে রাষ্ট্র কোনো ধর্মের স্বার্থরক্ষার জন্য লোকের উপর ট্যাক্স বসাবে না। এই ধারার সৃষ্টিকর্তাদের মনে বোধহয় জিজিয়ার তিক্তস্মৃতি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কার্যত এই ধারা হিন্দুর ধর্মকর্মের উপর ট্যাক্স বসানোর বাধা হয়নি এবং অন্য ধর্মগুলিতে subsidy জোগানোতেও বাধা হয়নি। ৮৫ সালে তিরুপতির আয়ের উপর ২০ কোটি টাকা কর ধার্য হয়েছিল। গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীর দেয় পিলগ্রিম ট্যাক্সের কথাও অনেকে শুনেছেন। এগুলো যদি প্রচ্ছন্ন জিজিয়া না হয় তবে জিজিয়া বলব কাকে? অন্যদিকে প্রাক্তন বিদেশসচিব A. P. Venkateswaran জানিয়েছেন, হজযাত্রায় কোটি কোটি টাকা জোগানো হয়। কী সুন্দর ব্যবস্থা! (৯৩ সালের হজ্বের খবর হচ্ছে হাজীদের জন্য ৪০ কোটি টাকা সাবসিডি ধার্য হয়েছে।

* কোরানে এই সমস্ত বাক্য আছে তা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না। তাঁদের আমি মৌলানা মোবারক করিম জওহরের বাংলা কোরানটি পড়তে বলি। এ বই বাঙালীর ঘরে-ঘরে থাকা উচিত।)

লক্ষ বালক-বালিকা যাতে প্রতিদিন এই সমস্ত 'আশমানী জবানের' চর্চা করতে পারে, ভারতরাষ্ট্র তারি জন্য ঢালাও 'সাবসিডি' এবং অফুরন্ত দাক্ষিণের দোকান খুলে বসে আছে কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন বা আর্য সমাজের মতো প্রতিষ্ঠানকে বলছে, তোমরা আগে non-Hindu বলে নাম লেখাও, তা নইলে এক কানাকড়ির অনুদানও তোমরা পাবে না। সংবিধানের ৩০ নং ধারাই হিন্দুর উদ্দেশে এই শক্তিশেলটি নিক্ষেপ করেছে এবং দেশের প্রতিটি প্রচারযন্ত্রই এই অপূর্ব ব্যবস্থাকে সেক্যুলারিজমের মহিমা হিসাবে ঢাক বাজিয়ে প্রচার করছে। হিন্দুরাষ্ট্রের দরকার এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ উলটে দেবার জন্যই। কিন্তু কোরানের 'ফাতিহা' বা 'ইখলাখ' আওড়ানোতে বাধা দেবার দায়িত্ব তার নয়। গলপেলের কেতাবগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

(২) হিন্দুর প্রত্যেকটি ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে এদেশের ম্যাসমীড়িয়াগুলির চব্বিশঘণ্টাব্যাপী কুৎসা রটনার নিবারণও হিন্দুরাষ্ট্রের ন্যূনতম লক্ষণের মধ্যে পড়ে। আমাদের সংবাদপত্রের মালিকানা আজ আর ব্রিটিশ বা বিদেশী পুঁজির মালিকানা নয়। কাজেই কতকোটি পেট্রডলার, কত কোটি মার্ক, স্টার্লি, ইউ. এস. ডলার এবং কত কোটি রুবল-ইউয়ান এই সব ব্যবসার পিছনে তলায় তলায় কাজ করে চলছে তা আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি, তার নথিপত্র ঘটিত প্রমাণ আমরা দাখিল করতে পারি না। কিন্তু ঐ সমস্ত বিদেশী পুঁজির প্রচ্ছন্ন প্ররোচনার বাইরে হিন্দুধ্বংসের একটা দেশী কলও ভারতের মাটিতে সগৌরবে বিদ্যমান। এই কলের মূল বোতামের বাক্সটা আছে পণ্ডিত নেহেরু প্রবর্তিত 'ড্যাইন্যাস্টিক বংশধারার মধ্যে। প্যান-ইসলামী 'কানেকশন' থেকে আরম্ভ করে—আন্তর্জাতিক সোশ্যালিস্ট 'কানেকশন'—এমনকি রাজীব গান্ধীর সময় থেকে ভ্যাটিকান কানেকশন পর্যন্ত সব কয়টি সূত্রটি মোটামুটি প্রকাশ্য ভাবেই ঐ বংশধারার আশ্রয়ে থেকে হিন্দুবিনাশী কাজে লিপ্ত হয়ে আছে। আমরা জানি, রাজবংশ মাত্রেরই কিছু আন্তর্জাতিক 'কানেকশন' থাকে এবং ওটাকে কেউ দেশের প্রতি বেইমানি বলে না। বিশেষ করে পণ্ডিত নেহেরুর প্রসঙ্গে 'বেইমান' শব্দটা উচ্চারণ করাও নাকি মহাপাপ হয়তো মনে মনে ভাবাও তাই; অন্য অনেকের মতো উপস্থিত লেখকও এই মহাপাপে লিপ্ত হতে চায় না। কিন্তু ঐ সমস্ত 'কানেকশানে'র প্রত্যেকটাই যে হিন্দুসমাজকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে চায় সে কথা আজ কারো কাছেই গোপন নেই। কাজেই ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিতজী, ইন্দিরাজী এবং রাজীবজীর হিন্দুবিদ্বেষের মাত্রা সম্বন্ধে যিনি যে মতই পোষণ করুন না কেন তাঁদের বংশধারার সংশ্লিষ্ট প্রচারক ও প্রচার মাধ্যমগুলির বিষাক্ত হিন্দুবিদ্বেষের চব্বিশঘণ্টা ব্যাপী রটনাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। অযোধ্যা-বিতর্কের সব দিকগুলি যাঁরা খুঁটিয়ে পড়েছেন তাঁরা জানেন ঐ বিতর্কের হিন্দুবিদ্বেষ ঘটিত বীভৎস কখনো বাব্‌রি কমিটির সদস্যদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায়নি—সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছে পণ্ডিত নেহেরুর নামে অনবরত জয়ঢাক

বাজানো কতকগুলি হিন্দুনামধারী মহাপুরুষের রচনায় এবং সে বীভৎসা জ্ঞানগবেষণার মান্যতা পেয়েছে পণ্ডিতজীর নামাঙ্কিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্বানদের শ্রান্তিহীন কলমবাজির বিরামহীন বিষোদ্‌গারে। অর্ধশতাব্দী ধরে হিন্দুসমাজের সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছে এই শ্রেণীর প্রচারযন্ত্রগুলোই। হিন্দুরাষ্ট্র যদি এই সারাভারতব্যাপী হিন্দুঘাতী প্রচারের শুকরনিবাসগুলির সংস্কার করতে না পারে তবে সে তার ন্যূনতম কর্তব্য থেকে ভ্রষ্ট হবে।

অবশ্য এ কর্তব্য একটা বড় দরের শিক্ষাসংস্কারের সঙ্গে জড়িত। দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা কেন বিশেষভাবে হিন্দুশিক্ষা হবে না, আজ পর্যন্ত কোনো পণ্ডিতই সে কথা আমাদের বোঝাতে পারেননি। স্মৃতিশাস্ত্রমূলক হিন্দুশিক্ষার প্রতি বহুলোকের আপত্তি থাকাই সম্ভব কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা উপনিষদ এবং ধম্মপদ-জাতকের শিক্ষা সম্বন্ধে কারো ভ্রূভঙ্গির কারণ দেখা যায় না। মুসলমান বা খ্রিস্টান বালক যদি ঐ শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে না চায় তাতে ঐ দুটি ধর্মের ঔদার্য প্রমাণিত হবে না—নূতন করে প্রমাণিত হবে সেই পুরাতন সত্যটাই যে, বাইবেল কোরানের মতো বিধর্মীঘাতক শাস্ত্রের বাইরে আর কোনো শাস্ত্রের চর্চা করতেও তারা কুণ্ঠিত। তবে এও বলব ঃ যে যে শাস্ত্রবাক্য খ্রিস্টান মুসলমানদের গলা দিয়ে নামবে না, হিন্দুরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা নিয়ে জবরদস্তিরও দরকার নেই আগেই বলেছি, মাদ্রাসা মক্তবের বদলে কোরানের 'ফাতিহা' বা 'ইখলাখের' মতো অধ্যায় বাইবেলের গসপেল কেতাবগুলি পড়ানোর ব্যবস্থাও হিন্দুরাষ্ট্রের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সসম্মানে বজায় রাখা যেতে পারে।

এ দুটিই আমার মতে ন্যূনতম লক্ষণের হিন্দুরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। এ দুটির দ্বারা সত্যিকার হিন্দুরাষ্ট্র তৈরি হবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এ দুটি ব্যবস্থা না থাকলে কোনো রাষ্ট্রই হিন্দুরাষ্ট্র পদের বাচ্য হবে না।

।। পাঁচ ।।

যারা বলে সব ধর্মই সমান

(১)

যারা বলে সব ধর্মই সমান, তাদের একদল বলে 'সব ধর্মই সমান মন্দ', আরেক দল বলে সব ধর্মই সমান ভালো।' প্রথমে দলের দৃষ্টান্ত হিসাবে মার্ক্স-লেনিনের নাম করা যায়, দ্বিতীয় দলের দৃষ্টান্ত হিসাবে রামকৃষ্ণ পরমহংস ও মহাত্মা গান্ধীর। দ্বিতীয় দলের মতটা 'সর্ব-ধর্ম-সমভাব' নামে প্রচার লাভ করেছে।

(২)

প্রথম দল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনার খুব একটা দরকার নেই। কেন না এ দেশে মার্ক্স-লেনিনের শিষ্যদের চোখে সব ধর্ম সমান মন্দ নয়। হিন্দুর ধর্মকর্মকেই এদেশের কমিউনিস্টরা প্রাণ খুলে গাল মন্দ করে অথচ ইসলাম খ্রিস্টান সম্বন্ধে তারা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। ভয়ানক কড়া অ্যাসিড ছাড়া সে কুলুপ খোলা যায় না। বিশেষ করে ইসলামের সঙ্গে এ দেশের কমিউনিস্টদের একট অদৃশ্য ঘাঁটছড়া বাঁধা আছে সব সময় সেটা অদৃশ্যও নয়। ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে ইসলামের সাম্যবাদ একটা মস্তবড় আদর্শ।* তারা মনে করে তুর্কিরাজত্বের যুগটাই ভারত ইতিহাসের সুবর্ণ যুগ। ইসলাম যে গোড়াতেই সময় মানব সমাজকে কাফেরে (অবিশ্বাসী) এবং মোমিন (বিশ্বাসী) ভাগ করা অথবা জিম্মি বা অধম নাগরিকে পরিণত করা যে ইসলামের শাস্ত্রীয় বিধান এ সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কোনো কমিউনিস্ট প্রচারককেই সরব হতে দেখা যায়নি। কাজেই মার্ক্সলেনিনের 'সব ধর্মই সমান মন্দ', এ মতটা এদেশে স্বীকৃত হয়নি বলা যায়।

(৩)

কমিউনিস্টদের স্বতন্ত্রভাবে দোষ দিয়ে লাভ নেই। এ যুগের বিদ্বান সমাজে সাধারণভাবেই যে হিন্দুবিদ্বেষ এবং 'সাম্যবাদী' ইসলামের স্তুতি শুরু হয়েছে তার তীব্রতা দেখলে অবাক হতে হয়। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের এক অংশে হিন্দুনিন্দার চরিত্রে সেই নিন্দুকের 'টাইপ'টাকে অমর করে গেছেন। কিন্তু ঐ হিন্দুনিন্দুকদের কাছে সদ্ধর্মের আদর্শ ছিলখ্রীস্টানিতে তাঁরা ইসলামে কোনো উচ্চাদর্শ খুঁজতে যান নি। এ যুগে কেবলমাত্র মনস্বী নীরদ চৌধুরীর মধ্যেই ব্রাহ্ম ধারার অনুবৃত্তি দেখা গেছে। এমনকি মাদার টেরেসার মহাভক্তরাও খ্রীস্টধর্ম নিয়ে মাতামাতি করেননি। ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এ দেশে খ্রীস্টানির জায়গায় ইসলামের স্তুতিবাদ এসেছে ৪৭-এর পরে। কেন এসেছে এখানে সেই কারণ-বিশ্লেষণে তত জরুরি নয়, কিন্তু এটুকু বলা দরকার যে ধর্ম সম্বন্ধে এই বৈষম্যবাদই আজকের বিদ্বান সমাজে প্রবল। কাজেই সব ধর্মই সমান মন্দ। এই মতবাদকে আজকের ভারতে প্রভাবশালী বলা যায় না।

---

* ইসলামে কোনো 'সাম্যবাদ' নেই, এমন কি কোরান-হাদিসে মুসলিম-ভাতৃত্বের কথা বলা আছে সেও আধুনিক অর্থে সাম্যবাদ নয়। এক-খলিফার একনায়কতন্ত্র তার গোড়ার কথা। সেইসঙ্গে হাদিসে বলা আছে সব দেশের মুসলমান হবে কোরেশ গোষ্ঠীর পদানত। এটাকে সাম্যবাদ বলা যায় না।)

(৪)

বরং 'সব ধর্মই সমান ভালো'—এই মতের প্রভাবই অনেক বেশি, এমন কি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে এই মতটাই অগ্রগণ্য। তিরুপতিতে যাঁরা মাথা না মুড়িয়ে রাষ্ট্রপতি বা ঐরকম কোনো পদের জন্য প্রতিযোগিতায় নামতে সাহস করেন না, তাঁরাই অন্য সময়ে মোল্লাটুপি পরে ইফতারের জমায়েতে খানা না খেয়ে ভোটের বাণিজ্যে নিষ্ক্রান্ত হতে ইতস্তত করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই সমভাবের রাজনীতিতে হিন্দুদের ঠাকুরকে শুধু বহু রাষ্ট্রপতির কেশগুচ্ছ পেয়েই খুশী হতে হয়েছে তাও আবার পক্ষ কেশের গুচ্ছ কিন্তু তাঁর মন্দির বা পূজারীদের কোনো বাড়বৃদ্ধি হয়েছে বলে শোনা যায় না।* ৪৫ বছর ধরে রামের কপালে শুধু অষ্টরম্ভাই জুটেছে কিন্তু বর্বর-লাঞ্ছিত হিন্দু মন্দিরগুলি যাতে চিরকালই ইসলামের জিম্মায় জিম্মি হয়ে থাকে তার জন্য পাশ হয়েছে আইন। আলিগড়ের মতো হিন্দুঘাতী প্রতিষ্ঠানের বাড়বৃদ্ধির জন্য ফি বছর হিন্দু কারদাতাকেই টাকা জোগাতে হচ্ছে ৪০ কোটি করে, এবং খ্রীস্টান মুসলমানের জন্য মাইনরিটি কমিশন পেয়েছে সমান্তরাল সরকারের 'স্ট্যাটিউটরি' স্বীকৃতি। এই সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, সর্বধর্মসমভাব থেকেও ফল হয়েছে একই। 'সব ধর্মই সমান মন্দ' এই মতের সবটুকু চোট যেমন হিন্দুর ঘাড়কেই বইতে হয়েছে, 'সব ধর্ম্মই সমান ভালো' এই মতের ফলাফলেও তেমনি আর কোনো ঘাড়ে চোট লাগেনি।

(৫)

কেন এমন হল, কী কারণে 'সর্ব ধর্ম্মই সমান ভালো'—এই উদার স্বীকৃতিটাও হিন্দুর ভাগ্যে শুধু দুর্ভাগ্যই বয়ে আনল, তা নিয়ে আমাদের একটু ভাবনা করার দরকার আছে। ভাবলে বোঝা যায় সর্বধর্মসমভাব বিশেষ ভাবে হিন্দুসমাজেরই নীতি—গান্ধী-রামকৃষ্ণ একটা প্রাচীন ধারাই মেনে চলতেন—ইসলাম-খ্রিস্টানি কোনো কালেই এই নীতির ধার ধারেনি। কিন্তু রাজনীতিতে হোক, সমাজে হোক ধর্ম্মের ক্ষেত্রে হোক, হিন্দু সমাজের এই নীতি ভারতে ইসলামের পদসঞ্চারের দিন থেকেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। 'ইসলাম' না বলে এখানে 'একেশ্বরবাদ' বলাই সঙ্গত, কেন না একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম মাত্রেরই মোট কথা এই যে, তাদের ঈশ্বর-ভাবনা ছাড়া জগতের আর সমস্ত ঈশ্বরভাবনাই ব্যর্থ, বর্জনীয়, এমন কি ধ্বংসের পাতালে প্রেরণীয়। এই প্রসঙ্গে একেশ্বরবাদের আনুষঙ্গিক একপয়গম্বরবাদ বা একত্রাতাবাদের কথাও বলতে হবে; সেই সঙ্গে এককিতাবাদের কথাও স্মরণযোগ্য। এগুলি সবই একেশ্বরবাদী ধর্ম্মের লক্ষণ। এই সমস্ত লক্ষণের প্রত্যেকটিরই মূল কথা হচ্ছে এক ধর্ম্মের ধর্মান্ধতা; সর্বধর্ম্ম-সমভাবের নীতি তার কাছে নিতান্ত অসহায়।

* ইদানীং শোনা যাচ্ছে নরসিংহ রাওয়ের প্রধানমন্ত্রিত্বে তিরুপতির ঠাকুরেরও কপাল ফিরেছে।

(৬)

আশ্চর্য এই যে, অনেকেই বোঝেন না, এই সিদ্ধান্ত শুধু ইসলাম সম্বন্ধে নয়, খ্রীস্টানি সম্বন্ধেও সমান সত্য। একটু আগে নীরদ চৌধুরীর নাম করছিলাম। তিনি যেভাবে নানা রচনার মধ্যে খ্রীস্টান সমাজের তুলনায় হিন্দুসমাজকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে ছোট করে দেখিয়েছেন সেগুলির মধ্যেও একেশ্বরবাদী ধর্মের ধর্মান্ধতা গোপন থাকে নি। তাঁর একটি বাংলা বই-এ তিনি ব্রাহ্ম নেতা কেশব সেনের সঙ্গে খ্রীস্টান নেতা ডঃ পিউজির (Pusey) একটা সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন। ঘটনাটা বোধহয় ১৮৭০ সালের। বলেন ঃ

কেশবচন্দ্রকে ম্যাক্সমুলার ডাঃ পিউজির কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে কেশব নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা বলিয়াছিলেন। ম্যাক্সমুলার ডাঃ পিউজিকে জিজ্ঞাসা করিলেন খ্রিস্টান না হইলে কাহারও মুক্তি সম্ভব কি না। ডাঃ পিউজি অবশ্য বলিলেন, 'না'। তখন কেশবের সহিত তাঁর 'বিচার' আরম্ভ হইল। কেশব বলিলেন ঃ ঈশ্বরের সহিত সতত যোগ রাখাই মুক্তি। ডাঃ পিউজি তাহা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তখন কেশব বলিলেন, 'My thoughts are never away from God. My life is a constant prayer, and there are but few moments in the day when I am not praying of God' এই কথা শুনিয়া ডাঃ পিউজি কিছু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন 'then you are all right.'

(৭)

খ্রীস্টধর্মমুগ্ধ নীরোদ চৌধুরী এই বিবরণের বিশ্রী দিকটা তলিয়ে দেখেননি। খ্রীস্টানদের—অন্তত খ্রিস্টান প্রচারকদের বিশ্বাস, অখ্রীস্টানকে কিছুতেই নরকের আগুন থেকে বাঁচানো যাবে না। ডাঃ পিউজি গত শতাব্দীর ইংল্যান্ডের এক নামজাদা ধর্মনেতা। তিনি সে যুগের অতি বিখ্যাত ধর্মনায়ক জন হেনরি নিউম্যানের শিষ্য—যে নিউম্যান একটা বাস্তব সত্যের মতো নরকাগ্নির প্রত্যয়কে তাঁর প্রত্যেকটি শিষ্যের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন। নিউম্যান অবশ্য শেষ পর্যন্ত ক্যাথলিক হয়ে গিয়েছিলেন, পিউজি ততদূর যাননি। কিন্তু পিউজি সম্বন্ধে সে যুগের ইংল্যান্ডে একটা মিথ্যাপ্রবাদ চালু হয়—তিনি নাকি সন্তানদের হাতে মোমের আগুনের ছ্যাঁকা লাগিয়ে নরকাগ্নির বাস্তবতা শেখাতেন। নীরদবাবু কেশব সেনের প্রতি তাঁর তাৎক্ষণিক প্রসন্নতার উপরেই জোর দিয়েছেন (then you are all right)। কিন্তু 'অখ্রীস্টান কখনো মুক্তি পাবে না।'—তাঁর এই ৭০ বছরের দৃঢ় বিশ্বাসটাকে তিনি গুরুত্ব দেননি। বস্তুত ওইটেই আজো প্রতিটি খ্রীস্টান প্রচারকের মর্মবাণী—ভারতের আর আফ্রিকায় এই প্রচারকদের সংঘই বেশী ধর্মগুলিকে ধ্বংস করার কাজে তৎপর হয়েছে। কেশব সেনের মতো, খ্রীস্টভক্ত অখ্রীস্টানই এই শ্রেণীর শোকের কাছে শুধু baptize না হওয়ার দোষেই damnation-এর পাত্র। এই ধর্মের সঙ্গে আর যাই চলুক সর্বধর্ম-সমভাবের নীতি চলে না।

(৮)

শান্তিবাদী খ্রীস্টধর্মের চরিত্রই যেখানে এরকম, সেখানে খঞ্জরবাদী ইসলাম সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বলাই ভালো। কোরানের ৩/৮৫ আয়াতে আছে 'ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মই আল্লার কাছে গ্রাহ্য হবে না'। ৪৭/১১ আয়াতে আছে ঃ 'আল্লা শুধুই বিশ্বাসীদের রক্ষক, অবিশ্বাসীদের কোনো রক্ষক নাই। ৯।৫ এবং ৮।৬৭ আয়াতে আছে আল্লার বিচারের জন্য অপেক্ষা না করে ইহজীবনেই কাফেরদের শেষ করে দেওয়া উচিত। এই শ্রেণীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সর্বধর্ম সমভাবের নীতি কোন্ কাজে আসবে?

(৯)

এই প্রসঙ্গে একটু Comparative Religion বা তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ নেওয়ার দরকার আছে। সর্বধর্ম-সমভাবকে আমি আগে হিন্দু সমাজের নীতি বলেছি বটে, কিন্তু হিন্দু শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশে ঠিক এরকম কথা নেই। সেখানে সমস্ত উপাসনা-পদ্ধতির সমত্বের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উপাসনা-সাম্য মানে ঠিক ধর্মসাম্য নয়। গীতায় যে নীতিটা ব্যক্ত হয়েছে সেটা এই ঃ

যে-অপি-অন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধায়ান্বিতাঃ
তে-অপি মামেব কৌন্তেয়-যজন্তে অবিধিপূর্বকম্।

একথার সোজা অর্থ হচ্ছে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যে বিষ্ণুর উপাসনা করে আর শ্রদ্ধার সঙ্গে যে আল্লার উপাসনা করে তাদের উপাসনার দাম একই। গীতা এমন কথা বলে নি যে ইসলামের কাফেরবাদ বা জেহাদতত্ত্বকেও হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্বের সমদৃষ্টিতে দেখতে হবে। হিন্দু রোজা-নামাজকে শ্রদ্ধা করতে বাধ্য বটে কিন্তু নিজের ধর্মকে 'কাফেরি' বল তার উপর অষ্টপ্রহরের তিরস্কার লাঠালাঠি ও খঞ্জর চালনা সহ্য করতে বাধ্য নয়। আরেকবার বলছি তার সাম্য ধর্মসাম্য নয়—তার সাম্য উপাসনার সাম্য নয়।

(২) ইসলামে কোনো সাম্যের কথাই বলা হয়নি। একটু আগে কোরানের যে আয়াতগুলির উল্লেখ করেছি যথা ৩/৫৮, ৪৭/১১, ৯/৫, ৮/৬৭—ওগুলির মতো পর ধর্ম-সহিষ্ণু বক্তব্য আর কোনো ভাষায় বলা সম্ভব নয়। এগুলির সঙ্গে শুধু 'কল্মা'র কথাটা যোগ করব। 'কল্মা' হচ্ছে ইসলামের বীজমন্ত্রের মতো তার গোড়াতেই বলা হয়েছে 'আল্লা ছাড়া দেবতা নেই।' এটা গীতার 'অন্য-দেবতা' তত্ত্বের ঠিক বিপরীত। ইসলামে সর্বধর্ম-সমভাবের কোনো স্থানই নেই।

(৩) বাইবেল সম্বন্ধেও একই কথা। সাধু (Saint) ম্যাথুর সুসমাচারে আছে ঃ

No one knows the Son except the Father and no one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal Him (Mathew 21/27).

অর্থাৎ কিনা পরমপিতাকে জানতে হবে পরমপুত্রের (—যীশুর) শরণাগত হয়ে, তা নইলে যেতে হবে নরককুণ্ডে।—বাইবেলের ভাষা কোরানের চেয়ে একটু কম উগ্র বটে, কিন্তু তত্ত্বটা একই।

(১০)

এই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের পাঠ থেকে বোঝা যায় সব ধর্ম সমান নয়। কিন্তু এও বোঝা যায় হিন্দুর উপাসনাসাম্যকে ধর্মসাম্য নাম দিয়ে ইসলাম-খ্রীস্টানির পরধর্ম-বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, হিন্দু সেটা মানতে বাধ্য নয়। খুব সম্ভব গান্ধী-রামকৃষ্ণও উপাসনা-সাম্যের তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন কিন্তু তাঁদের কথার অপব্যাখ্যা করেই হোক অথবা যেভাবেই হোক হিন্দুর উপর যে সর্বধর্ম-সমভাবের তত্ত্ব চাপানো হয়েছে সে একেবারেই আত্মঘাতী। প্রশ্ন হচ্ছে, এর কি কোনো প্রতিকার আছে?

(১১)

প্রতিকার শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক,* কিন্তু এখানে আমি রাজনীতির আলোচনায় যাব না। আমি বলব আমরা 'গণতন্ত্র' 'গণতন্ত্র' বলে চব্বিশঘণ্টা হট্টগোল করি বটে কিন্তু তার রাজনৈকি অভিব্যক্তির উর্ধ্বে যে বিচারবুদ্ধির গণতন্ত্র সবচেয়ে দামী জিনিস, তার অভাবেই হিন্দুর সর্বনাশ হতে বসেছে। বিচার-বুদ্ধির গণতন্ত্র যদি আমাদের দেশে থাকত, তবে আমাদের বিধান সমাজ নিশ্চয়ই একেশ্বরবাদের ধর্মগত অগণতান্ত্রিক জবরদস্তির দিকে নজর দিতেন। সর্ব ধর্মসমভাব নয়,—বিচার-বুদ্ধি দিয়ে একেশ্বরবাদী ধর্মের সঙ্গে বোঝাপড়া করাই আজকের দিনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

(১২)

হিন্দুদের আজ স্পষ্ট ক'রে বোঝার দরকার আছে একেশ্বরবাদের মতো বি-ধর্মীগ্রাসী ধর্মকে বৈষ্ণব, শৈব, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বহুদেবক ধর্মের সঙ্গে সমান ক'রে দেখার ফল অতি বিষময়। এই বিষয় রাজনৈতিক দাওয়াই কাম্য বটে,* কিন্তু সে দাওয়াই-এর জন্য বসে না থেকে একেশ্বরবাদের বিরুদ্ধে একটা সারা দেশ জোড়া বিচারের লড়াই খাড়া করা অত্যাবশ্যক। এই বিচারের স্তর অনেক গুলি। (১) একটা স্তর ঐতিহাসিক। একেশ্বরের নামে মূসার আমল থেকে বি-ধর্মীকে শেষ করবার জন্য যে গণহত্যার ধারা শুরু হয় এবং

---

* রাজনীতি যদি এদেশে সর্বগ্রাসী না হত তাহলে একথার সুযোগ থাকত না। 'মাইনরিটিইজম'-এর রাজনীতিই হিন্দুর সর্বনাশের মূল, কাজেই রাজনৈতিক প্রতিকারের কথা না বলে উপায় নেই।)

যুগ যুগ ধরে অনেকগুলি পয়গম্বরের হাতকে রক্তমাখা করে রাখে, তার বিবরণ আছে বাইবেলেই। পরের পর্যায়ের গণহত্যার বিবরণ পাওয়া যায় ইতিহাসে-গীবন এবং আরো অনেকের বই-এ। ভলটেয়ার গীবনকে বাদ দিলে এসব বই-এর বেশির ভাগ হচ্ছে খ্রিস্টানের লেখা। খ্রিস্টানের লেখা বলেই এগুলি নিরপেক্ষ নয়, কাজেই এই সমস্ত গণহত্যার নিরপেক্ষ বিবরণের জন্য হিন্দু পণ্ডিতের দরকার আছে। কোরানে ঐতিহাসিক গণহত্যার উল্লেখ বিরল অথবা বিরল না হলেও বাইবেলের পুনরাবৃত্তি মাত্র। কোরানে খাঁটি ইসলামের গণহত্যার উল্লেখ আছে শুধু কুরাইজা নামক ইহুদী গোষ্ঠীর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে—তাও অত্যন্ত সতর্ক ভাষায়। উল্লাসকর এবং সবিস্তার বিবরণ আছে হাদিসে এবং ইসলামের ইতিহাস গ্রন্থরাজিতে—আরবি এবং ফার্সি ভাষায় লেখা সে বিবরণ অজস্র, অগণ্য এবং পুঞ্জ-পুঞ্জ। হিন্দু বিদ্বানের পক্ষ থেকে এই বিপুল গণহত্যার ইতিহাস কাগজে-কলমে সাজিয়ে দেওয়ার দরকার আছে।

(২) আরেকটা স্তর হচ্ছে তাত্ত্বিক—সে স্তরে একেশ্বরবাদ, একপয়গম্বরবাদ এবং এককিতাববাদের অন্ধবিশ্বাসকে শুধু তর্ক-বিচার দিয়েই খণ্ড-খণ্ড করবার দরকার আছে। ঈশ্বর যদি থাকেন, তবে তিনি ঊর্ধ্বাকাশে বসে মানুষের দণ্ডমুণ্ডের ব্যবসা করছেন—একথা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য এবং কুসংস্কারী। এই কুসংস্কারের প্রতিকারকল্পে স্পিনোজা বা কান্টের মতো মনীষীরা একেশ্বরের একটা দার্শনিক প্রতিরূপের কল্পনা করতেন। সেই ঈশ্বর-কল্পনা উচ্চাঙ্গের বটে, কিন্তু কান্টের মতো দিগবিজয়ী পণ্ডিতও ওটাকে বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে মেলাতে পারেননি—তিনি বলতেন ওটা নাকি Practical Reason বা বাস্তব-বুদ্ধির দাবি। দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত মহর্ষিতুল্য মানুষের আবির্ভাবের পরেও খ্রিস্টান একেশ্বরবাদ তার বিধর্মীগ্রাসের উন্মাদনা থেকে মুক্ত হতে পারে নি—তাঁরা শুধু একেশ্বরের কল্পনাটিকেই উন্নত করেছিলেন। তাঁদের এই অসমাপ্ত বিচারধারাকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব আছে হিন্দু পণ্ডিতদেরই হাতে।

(৩) একেশ্বরবাদ-সমালোচনার আরেকটা স্তর হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। একেশ্বরবাদ যে আসলে এক ধরণের বামাচারের সাধনা—এক অশুভ প্রেতাত্মার নিশিডাক শোনা কতকগুলি উগ্রবাদী মানুষের মনোজগতের কামভূমির উলঙ্গ অভিব্যক্তিমাত্র—আধুনিক হিন্দু মনীষী রামস্বরূপের বইগুলিতে সে কথার বিস্তারিত বিবরণ আছে। এই বিচার ধারাকে সম্প্রসারিত করার দায়িত্বও হিন্দুর।*

* রামস্বরূপের The Word as Revelation—Name of Gods, Hindu View of Christianity & Islam প্রভৃতি বই দ্রষ্টব্য।)

(১৩)

হিন্দুকে যদি বাঁচতে হয় তবে এই ত্রিস্তরীয় বিচারধারাকে এ দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে হবে। এ দায়িত্ব বিশেষভাবে হিন্দুরই, কেন না ১৯৪৭-এর পর থেকে ভোটনির্ভর রাজনীতি এবং সেকুলারিজম্ তত্ত্বের উপর তার পৈশাচিক নাচন-কোদন শুরু হয়েছে। ৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তামিলনাড়ুর মীনাক্ষিপুরম গ্রামের লোকগুলি রাতারাতি মুসলমান হয়ে যায়। বঞ্চিত ওষ্ঠাধরের সামনে আরব দেশীয় একেশ্বরবাদীদের দোদুল্যমান পেট্রডলাররাশির হাতছানির আমন্ত্রণে তারা স্থির থাকতে পারেনি। ভারতের বনাঞ্চলগুলিতে একই রকম অপকর্ম্ম করছে পোপের চেলা-চামুণ্ডারা। রাষ্ট্র সব কিছুই দেখছে শুনছে, কিন্তু এই সমস্ত নিবারণে সে একফোঁটা উদ্যম করেছে বলে প্রমাণ নেই। সাধারণ হিন্দু সমাজের নিষ্ক্রিয়তা এ ক্ষেত্রে আত্মঘাতী না হয়ে পারে না। এইজন্যই এই ত্রিস্তরীয় বিচার ধারার উত্থাপন, বিকিরণ ও বিচ্ছুরণের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগের দরকার আছে।

বলিহারি যাই মানবধর্ম্মের বুলি হাঁকড়ানো সেই হিন্দুবংশজাত মহাপুরুষদের যাঁরা হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্মকে উদয়াস্ত গালমন্দ না করে জল খান না অথচ একেশ্বরবাদের সামনে থাকেন জুজু হয়ে। এঁদের হিন্দু-বিদ্বেষের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা করে লাভ নেই, কেননা যে জিনিসটা এঁদের বৌদ্ধিক জীবনের যথাসর্বস্ব, তার অপলাপ এঁদের কাছে মৃত্যুর সমান বা ততোধিক। এত বড় দণ্ড এঁদের দেওয়া যায় না। কিন্তু এঁরা যখন মানবধর্মের সঙ্গে সঙ্গে 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বুলি কপচিয়ে আসার মাত করতে চান, তখন শুধুই মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার আছে যে আজকের ভারতে গণতন্ত্রের পরম শত্রু হচ্ছে একেশ্বরবাদ। চরমপন্থী আকালীরা এই একেশ্বরবাদকেই বৈষ্ণব শিখসমাজের গলায় কৃপাণ আর এ. কে. রাইফেলের গুঁতো মেরে ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছে। কাশ্মীরি জেহাদীরা এরই নামে ধ্বংস করতে চাচ্ছে কাশ্মীরবাসী হিন্দুজনকে। গণহত্যা, গণতাণ্ডব এবং বিদেশী ডলার পুঞ্জীভূত গণ-অনুদান এদেশে গণতন্ত্র-ধ্বংসের ব্রহ্মাস্ত্র হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। এখনো বোধহয় সময় আছে; 'গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের' উপাসকরা এই মহাবিপদ সম্বন্ধে এখনো সজাগ হতে পারেন নি। কিন্তু এও প্রত্যেকের বোঝা উচিত, অঢেল বা অফুরন্ত সময় আজ আর নেই। 'সর্ব ধর্মই সমান' বলে গোলে হরিবোল দেবার দিন আজ অতীত হয়ে গেছে।

উপসংহার

(১) জেহাদী ইসলাম, (২) মিশনারি খ্রীস্টানি (৩) হিন্দু পরিচয় অস্বীকার করা মানব ধর্মবাদ (humanism) এই তিন তত্ত্ব কীভাবে বর্তমান হিন্দু সমাজের বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই এ বই-এর উদ্দেশ্য। এর শেষ প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে সর্বধর্ম

সমভাবের মতো 'হিন্দু'তত্ত্ব দিয়েই কীভাবে হিন্দু সমাজকে ধরাশায়ী করা যায়, সেই চেষ্টা এযুগের এক শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতা ও বিদ্বানের মধ্যে ফণা ধরে উঠেছে। উপসংহারে সমস্ত বইটার একটা সারসংক্ষেপ করা হয়তো যুক্তিযুক্ত, কিন্তু ছোট পুস্তিকাকে আরো ছোট করে পাঠকের শ্রম লাঘব করা শেষপর্যন্ত লাভজনক হয় না। এইজন্য একটা বিশেষ কথার উপর জোর দিয়েই আমি এই আলোচনার পূর্ণচ্ছেদ করতে চাই।

কথাটা এই যে, বই-এ 'Hinduism in Danger'-এর আওয়াজ তোলা হয়েছে সেটাকে কেউ যেন সুপরিচিত 'ইসলাম-ইন-ডেঞ্জারের' আওয়াজের সঙ্গে তুলনা করে লেখকের প্রতি কৃপাপরবশ না হন। যাঁরা এই কৃপাদৃষ্টি দিয়ে লেখককে অভিষিক্ত করতে চাইবেন তাঁদেরকে আমি যথাযোগ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলব, কৃপার যথার্থ প্রয়োজন কার—তাঁদের না এই লেখকের তা যেন তাঁরা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবনা করেন। আর কিছু না হোক তাঁরা যেন শুধু এটুকুই ভেবে দেখেন, 'হিন্দু ইজম ইন ডেঞ্জারে'র আওয়াজটা এদেশে অত্যন্ত নূতন—আচমকা এই নূতন আওয়াজটা উঠলই বা কেন? উল্টোদিকে 'ইসলাম ইন ডেঞ্জারে'র আওয়াজটা মোটে নূতন নয়। বরং ঐ আওয়াজের অত্যাধিক্যের জন্যই কি তাঁরা ওটাকে নিয়ে হাসাহাসি করেন না? সে দিক থেকে 'হিন্দুইজম ইন ডেঞ্জারে'র আওয়াজটার নতুনত্ব দেখেই তাদের থমকে দাঁড়ানো উচিত। বুকের উপর নিজেদের ডান হাত রেখে একবার ভেবে দেখা উচিত, এই আওয়াজের মধ্যে যদি যৎকিঞ্চিৎ মাত্রও সত্যতা থাকে, তবে ঐ সম্ভাব্য বিপদের দিনে তাঁদের হাস্য পরিহাসময় অস্তিত্ব ও কি বজায় থাকবে? সাহেবরা বলেন, Charity begins at home। আমি বলি, Survival begins with ones won precious self। এইজন্য উদারপন্থী, প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী, হিন্দুর হিন্দুত্ব নিয়ে অনবরত হাস্য মুখর সজ্জনবর্গের উদ্দেশ্যে আমার জিজ্ঞাসা, এ দেশে হিন্দুর অস্তিত্ব যদি লোপ পায় তবে তাঁদের নিজেদের অস্তিত্বও কি নিরাপদ থাকবে? খুব সম্ভব, দশ বছর আগেও এরকম প্রশ্ন শুনে তাঁদের মুখ কৌতুক হাস্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠত, কিন্তু সেই উজ্জ্বলতার দিন কি আর আছে? ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। কিন্তু কালবৈশাখীর পুঞ্জীভূত ঘনঘটাকে যারা কালো মেঘ ভেবে নিশ্চিন্তে থাকতে চায়, তাদের আমরা কোন্ প্রাণীর কোঠায় ফেলব?

এই লেখকের অন্যান্য বই

১। মেকলের সম্প্রদায়—বঙ্গ দ্যুতির পরিণাম (১৮২৪-১৯৮৯)
২। স্বদেশী সমাজ ও বাঙালী বিদ্বান (১৯৯০-৯২)
৩। জেহাদ ৪। বর্তমান হিন্দু মুসলিম সংঘর্ষ ৫। কাশ্মীরে জেহাদ

মূল্য ঃ ২০ টাকা